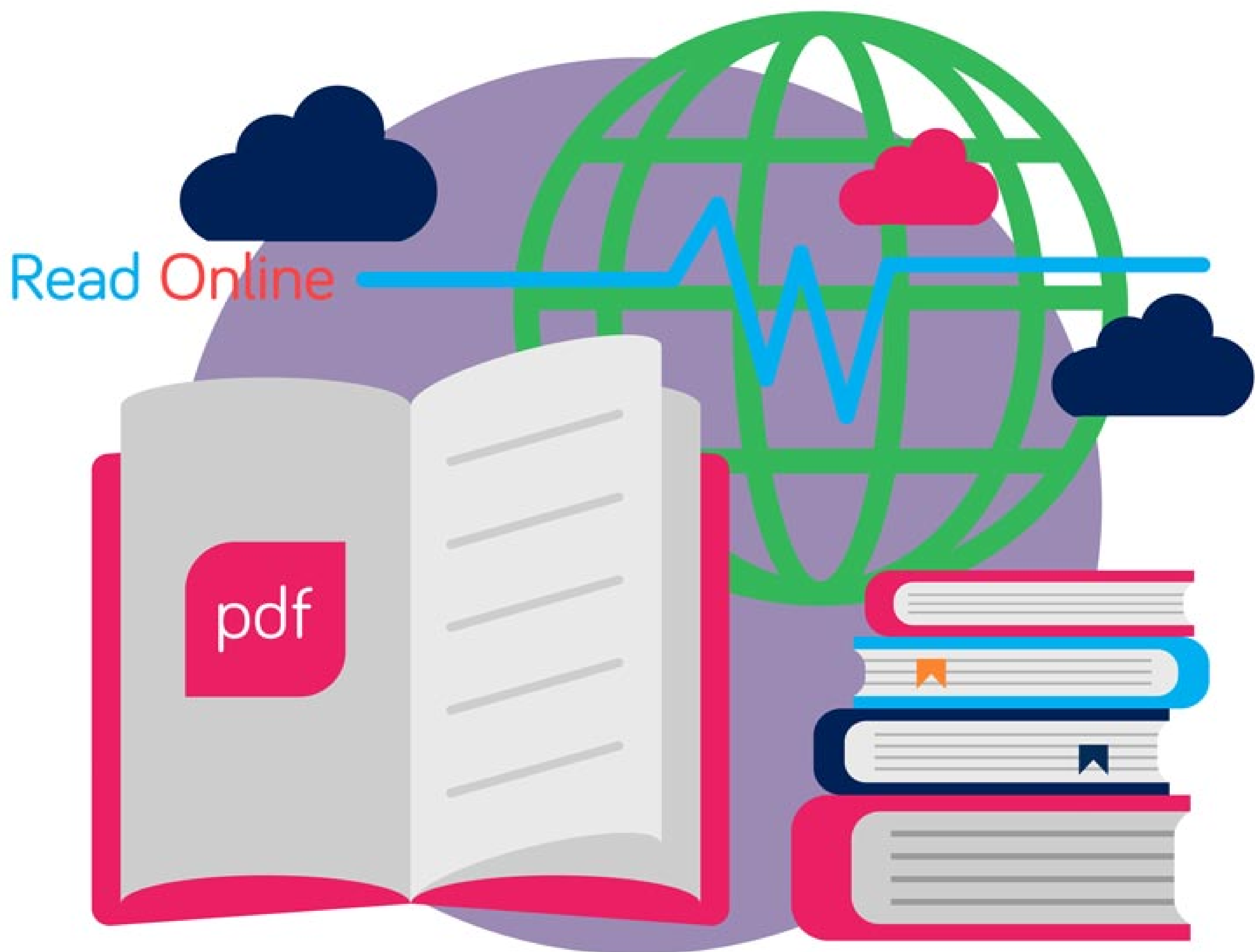
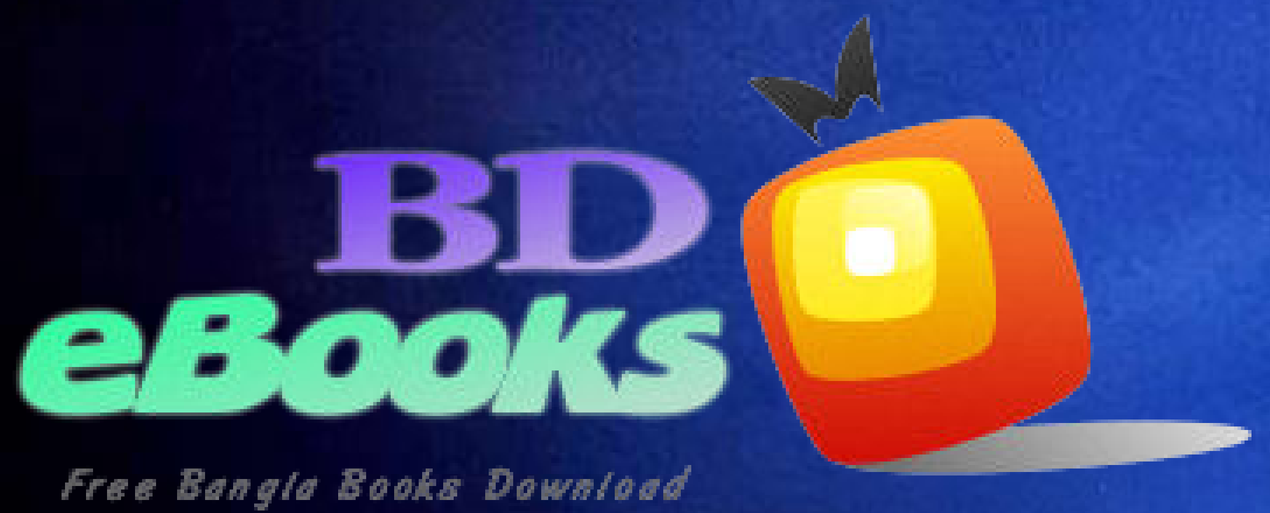


E-BOOK

নন্দিনী

আনিসুল হক



উ | ৎ | স | র্গ

প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিক
ইমদাদুল হক মিলন অগ্রজপ্রতিমেষু
বাংলাদেশের প্রকাশনা-জগত যাঁর কাছে ঋণী

মুক্তি যোগ দেবার পর থেকে স্বরবর্ণ থিয়েটারে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এখন অনেকেই ঠিকমতো ধোয়া কাপড়চোপড় পরে আসে। আগে হতো এর উল্টো। যেমন— মাইনুল গোটা শীতকাল গোসল করেনি। সে তরুণ কবি। তার গালে এক পশলা দাড়ি, অযত্নে অবহেলায় বেড়ে ওঠা মাথাভরা রুক্ষ চুল, পরনে একটা জিনসের প্যান্ট, গায়ে একটা শার্টের ওপরে জ্যাকেট। রংপুরের শীত খুব বিখ্যাত। তার চেয়ে বিখ্যাত মাইনুলের গোসল না করা। সে যে ঘরে ঢোকে, সে ঘরে পাঁঠার পক্ষেও টেকা মুশকিল। এই রকম বোঁটকা গন্ধ মাইনুলের গায়ে। সেদিন সে এসে মানুদাকে বলল, মানুদা, দুই মাস পর গোসল করলাম। রাস্তা দিয়া রিকশা চইড়া যাইতেছি, সেনপাড়ার জোড়া পুকুরের মাঝখানে গিয়া যখন দেখলাম দুইটা পুকুর, টলটলা পানি, স্থির থাকতে পারলাম না, রিকশাওয়ালাকে বললাম, খাড়াও তো, তোমার গামছাটা দেও। রিকশাওয়ালা খাড়াইল, আমি স্ট্রেট পানির মধ্যে নামি গেলাম। আহ কি ফ্রেশ লাগতেছে!

মানুদা তাকে বললেন, তুমি তো মিয়া ফ্রেশ হলে, ওই পুকুরের কী হলো?

মানে? পুকুরের কী হইল মানে?

পুকুরের পানি ঘোলা হয়ে গেল, নাকি গরমে ফুটতে লাগল?

তরুণ কবি মাইনুল মানুদার রসিকতাটা মনে হয় ধরতে পারেন নাই।

এমন যে মাইনুল, সেও এখন দেখা যায়, বিকাল হলেই রিহার্সালে চলে আসে, এবং তার পরনে ধোয়া কাপড়চোপড়। এটা কেন হলো? কারণ মুক্তি। স্বরবর্ণ থিয়েটারে নতুন মেয়ে এসেছে, তার নাম মুক্তি। মুক্তি এই গ্রুপ থিয়েটারটাতে এক ধরনের মুক্ত বাতাস বইয়ে দিতে পেরেছে।

আজ শুক্রবার। আজ বিকাল তিনটা থেকেই রিহার্সালের কল। পৌনে তিনটার সময় মানুদা সাইকেলে চড়ে হাজির হয়েছেন তাদের থিয়েটারের কার্যালয়ে। শীতের বিকাল টাউন হলের সবুজ মাঠে মানুদার লম্বা ছায়া ফেলল, হলুদ রোদের বিপরীতে। সাইকেলটা তাদের একতলা টিনে ছাওয়া অফিসঘরের সাদা দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখলেন মানুদা। লম্বা পাঞ্জাবির ওপরে খয়েরি

রঙের চাদর, মাথায় টাক, মুখটা সুচাল, গায়ের রং তামাটে, পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে চাবি বের করলেন তিনি। এদিক-ওদিক তাকালেন। পৌনে তিনটা বাজে, কেউ আসে নাই? অফিস সেক্রেটারি হলো শাহিন। তালা খোলার কথা তার। সে না এলে মানুদাকেই তালা খুলতে হবে।

ভাবতে ভাবতেই শাহিন হাজির। আদাব মানুদা।

মানুদা আশ্বস্ত বোধ করলেন। শাহিনের লোভ কার্যালয়ের চাবিটার দিকে। সে বলে, আমি দপ্তর সম্পাদক। দপ্তরের চাবি তো আমার কাছেই থাকবে। মানুদা তাকে চাবি দিতে নারাজ। অফিসে মূল্যবান কিছু থাকে না। তবে ছেলেপেলেদের বিশ্বাস নাই। দেখা যাবে, তার অনুপস্থিতিতে অফিস খুলে ফেন্সিডিলের আসর বসিয়েছে।

কই ছিলে এতক্ষণ? দেখলাম না। মানুদা শাহিনের দিকে চাবি বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন।

এই তো মানুদা, পাবলিক লাইব্রেরিতে বসে পেপার পড়তেছিলাম।

ভালো। আজকের সাময়িকী পড়েছ? শামসুর রাহমানের একটা ভালো কবিতা ছাপা হয়েছে।

না পড়ি নাই।

পড়ো। ভালো কবিতা।

শাহিন তালা খুলল। মানুদা ঘরে ঢুকলেন। বন্ধ ঘরটা অন্ধকার আর গুমোট। তিনি জানালাগুলো খুলতে লাগলেন। শাহিনও তার সঙ্গে জানালা খোলার কাজে হাত লাগাল।

শিল্পকলার মাঠে আরও দুটো ছেলেমেয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে বসে ছিল। তারা চলে এল। ছেলেটা কামাল। মেয়ের নাম মোনা।

তারা দুজন সালাম দিল মানুদাকে। মানুদা সালামের জবাব দিয়ে বললেন, এসেছ? তিনি কামালের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। এই মেয়ে কামালের সঙ্গে শিল্পকলার বারান্দায় বসে গল্প করছিল নাকি। ব্যাপার কী?

মোনা মেয়েটি বোধহয় মানুদার দৃষ্টির ভাষা পড়তে পারল। সে মেঝের শতরঞ্জিটা টেনে লম্বা করতে করতে বলল, আব্বা নামায়া দিয়া বাজারে গেল। তাই তাড়াতাড়ি আসছি।

কামাল লেগে গেল ঝাড়ু হাতে। ঝাড়ু দিতে দিতে সে বলল, আমি তো মানু ভাই তাড়াতাড়িই আসি।

মানুদা এককোণে রাখা একটা আলমারি খুলে একটা রেজিস্ট্রি খাতা বের করলেন। এটা হলো হাজিরা খাতা। কে এলো না এলো, এই খাতায় লেখা

থাকবে। উপস্থিতরা নাম সই করবে।

কামাল বলল, মানুদা, দুনিয়াটা একটা নাট্যমঞ্চ। আর আমরা সবাই হলাম অভিনেতা-অভিনেত্রী। এটা সেক্সপিয়ার বলেছেন না?

কামাল শেক্সপিয়ার শব্দটা উচ্চারণ করল সেক্সপিয়ার। এই জিনিসটা মানুদার খুবই অপছন্দ। সেক্স জিনিসটাও বোধহয় তার প্রিয় বিষয় নয়। তিনি রাগতস্বরে বললেন, সেক্সপিয়ার না, শেক্সপিয়ার। উচ্চারণ ঠিকভাবে করবে।

কামাল লজ্জিত মুখে বলল, জি শেক্সপিয়ার।

মানুদা জিজ্ঞাসু নয়নে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হঠাৎ তেনার কথা ক্যানো?

কামাল বলল, সেনপাড়া দিয়া আসতেছি। রাস্তার ধারে বাচ্চা শোওয়া, মহিলা কানতেছে, বাচ্চা মারা গেছে, কাফনের কাপড়ের জন্য সাহায্য করেন। দশটা টাকা দিলাম। পরে স্টেশন রোডে দেখি ওই মহিলা আর তার ছেলে দিব্যি হেঁটে চলে যাচ্ছে। কী রকম অ্যাকটিং দেখেন। আমি পর্যন্ত ধরতে পারলাম না।

এরই মধ্যে একজন দুজন করে সদস্য সদস্যারা এসে ঢুকছে।

কামাল বলেই চলেছে, তাই তো বললাম, সেক্স.. শেক্সপিয়ার বলেছেন, দুনিয়াটা একটা নাট্যমঞ্চ, আর আমরা সবাই হলাম...

মানুদা বিরক্ত হলেন। শেক্সপিয়ারের কথাটার মানে এই রকম নয়। কামাল কথাটার অপব্যাখ্যা করছে। তিনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, শোনো, শেক্সপিয়ার যা বলেছেন, সেটার মানে এটা না। রাস্তায় আমরা কে কী ভান করলাম, তা না।

সদরুল স্থানীয় দৈনিক দাবানল পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখে, কাজেই সে বুদ্ধিজীবী পদবাচ্য, সে কামালকে এই সুযোগে জ্ঞান দেয়, আরে শেক্সপিয়ারের কথাটার মানে হইল, একটা চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া জনম ভরে চলতে আছে, তিনি ডায়লোগ দেওয়ান, তাই আমরা দেই...তিনি হাসান, তাই আমরা হাসি...তাই না মানুদা।

মানুদা গম্ভীর মুখে বলেন, ঠিক। শোনো, কথায় কথায় বোকার মতো কোটেশন ঝাড়বে না, আর তার ভুল মানে করবে না।

ইতিমধ্যে রুমে ১০/১২ জন এসে গেছে। সবাই হাজিরা খাতায় নিজের নাম লিখেছে ও স্বাক্ষর দিয়েছে।

মানুদা বারবার ঘড়ি দেখছেন। সবাই এলেও মনে হচ্ছে কেউই আসে নাই। এর কারণ মুক্তি। মুক্তি এখনও আসে নাই। তিনি বারবার দরজার দিকে দেখছেন। রিকশা জাতীয় কিছু এলেই মনে হচ্ছে মুক্তি এসে গেল বুঝি। শেষে বলেই ফেললেন, মুক্তি এলো না এখনও। সময়জ্ঞান যাদের নেই, তাদের তো

গ্রুপ থিয়েটার করার দরকার নেই। একজনের জন্য তো সবাই ভুগতে পারে না। রেজা স্যারের আসার সময় হয়ে গেল।

হ্যাঁ, রেজা স্যার আসবেন। এটা আজকে একটা বড় ঘটনা। রেজা স্যার রংপুর কলেজের বাংলার অধ্যাপক। *উত্তরাঞ্চলের লোকছড়ায় নারীর অবস্থান* ও *রবীন্দ্রকাব্যে বাকপ্রতিমা* নামে দুটো বইয়ের তিনি প্রণেতা। এই শহরে তিনি প্রধান রবীন্দ্র-সমালোচক। আজকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রিহার্সাল দেখার জন্যে। *স্বরবর্ণ থিয়েটার* এই প্রথম রংপুরে রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* নাটকটি মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছে। দুরূহ নাটক। আগাপাছতলা কিছুই বোঝা যায় না। তার ওপর টেলিভিশনে কবে মুস্তাফা মনোয়ার এটা করেছিলেন, গোলাম মুস্তাফা করেছিলেন রাজার পার্ট, তার সুখ্যাতি এখনও সারাদেশে কিংবদন্তির মতো ছড়িয়ে আছে, এই নাটক করা কি যা-তা কথা। ঢাকার নাগরিক পর্যন্ত সাহস পায় না। কাজেই রেজা স্যারকে রিহার্সালটা একবার দেখিয়ে নেয়া ভালো। সত্যি কথা বলতে কি, মানুদা নাটকের পরিচালক বটে, এবং পরিচালক হিসাবে নাটকটা তিনি পুরোপুরি বোঝেন, এই রকম একটা ভঙ্গি তাকে সারাক্ষণই করতে হচ্ছে, আসলে তারও বুঝ পরিষ্কার নয়। রেজা স্যার যদি বিষয়টা ঠিকমতো বুঝিয়ে বলেন, তাহলে সবারই কাজে লাগবে।

শাহিন বলল, মানুদা, রেজা স্যারকে ফুলটা কে দেবে। মুক্তা যদি না আসে। কতগুলো রজনীগন্ধা কিনে আনা হয়েছে জেলা পরিষদের সামনের ফুটপাথ থেকে, রজনীগন্ধার নামানুসারে তার উচিত অন্তত রাতের বেলা গন্ধ বিতরণ করা, কিন্তু এই দেশে সবই ভেজাল, হাইব্রিড এসব রজনীগন্ধার গায়ে শটির গন্ধ, ফুলের গন্ধ নাই। মানুদা সেই ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, মোনা দিও।

রোদ আরেকটু মরে এসেছে বাইরে। শিল্পকলার ঘরে ছেলেমেয়েরা হারমোনিয়ামে সা-রে-গা-মা গাইতে শুরু করে দিয়েছে।

একটা রিকশায় চড়ে রেজা স্যার চলে এলেন।

শুধু মুক্তি এলো না।

আর বায়েজিদ নেই। সন্দেহজনক। বড়ই সন্দেহজনক। মুক্তি মেয়েটার পেছনে বায়েজিদ লেগেছে মনে হচ্ছে। না। এসব প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। আমরা গ্রুপ থিয়েটার করতে এসেছি। রঙ্গ-তামাশা না। ফেব্রুয়ারি মাসেও মানুদা ঘামতে শুরু করলেন।

রেজা স্যার স্বরবর্ণ থিয়েটারের দপ্তরে পা রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। পেছনে পেছনে বায়েজিদও এল। বায়েজিদকে দেখে মানুদা

খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। যাক। বায়েজিদ তাহলে মুক্তির সঙ্গে ছিল না। রেজা স্যারকে রিকশায় করে নিয়ে এসেছে এই ঢ্যাঙা বায়েজিদ। ঢ্যাঙা তার নাম নয়, বিশেষণ। সে বেশ লম্বা বলে নামের আগে এই বিশেষণ পেয়েছে। আর একজন আছে বায়েজিদ, এই শহরে, তাকে লোকে ডাকে বাঁইটা বায়েজিদ বলে। ওই বিশেষণটাও শারীরিক উচ্চতার পরিচায়ক। বায়েজিদ রিকশাভাড়া দেয় নাই, ভেবেছে স্যারকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর নিজে বাইরে এসে ভাড়াটা দিয়ে দেবে।

রেজা স্যারকে দেখে মানুদা এগিয়ে গেলেন, আদাব স্যার। কেমন আছেন?

রেজা স্যার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, আছি আর কী! আজকে হঠাৎ করে গরম পড়ে গেল মনে হচ্ছে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো বসো সবাই।

সবাই বসল। মানুদা ইঙ্গিত করলে মোনা ফুল নিয়ে এগিয়ে গেল রেজা স্যারের দিকে।

মানুদা বিনয় গদগদ ভঙ্গিতে বললেন, স্যার। আপনার জন্য ফুলের... শুভেচ্ছা...

রেজা স্যার দাঁড়িয়ে ফুলটা হাতে নিয়ে বললেন, আরে আরে, আবার ফরমালিটিজ করতে গেলে কেন ? ধন্যবাদ।

মানুদা বললেন, একটু পরে শুরু করি স্যার। একটু চা খান। আমাদের একজন কর্মী এখনও আসে নি। এই মিজান, একটু চা দিতে বলো না ভাই। স্যার, আপনার তাড়া নাই তো?

রেজা স্যার ঘরের এক কোণে রাখা আলমারির বইগুলো জরিপ করতে করতে বললেন, না-না। তোমরা ধীরে ধীরে শুরু করো। গল্পটল্প করি। ওই যে শেক্সপিয়ার বলেছিলেন না, দি ওয়ার্ল্ড ইজ আ স্টেজ, অ্যান্ড অল দি মেন অ্যান্ড উমেন মেয়ারলি প্লেয়ারস।

মানুদা হাত কচলে বললেন, জি স্যার। বলুন।

রেজা স্যার বললেন, আজকে কী কাণ্ড হয়েছে শোনো। এক মহিলা এসে বলে তার মা মারা গেছে। কাফনের সাহায্য দেন। আমি তো চেহারা ঠিকই মনে রেখেছি। এক সপ্তাহ আগে আমাদের কলেজে গিয়ে সে একই কথা বলে সাহায্য চেয়েছে। আমি যেই বললাম, এক মা কবার মরে? সে কি মা মা বলে কান্না, আশপাশের সবাই এসে আমাকে ধরল, আরে না, মারা না গেলে কেউ এভাবে কাঁদতে পারে। কেমন অভিনয় দেখো। এইজন্যে বলছিলাম শেক্সপিয়ার বলে গেছেন...

শাহিন কাশি দিল। হুবহু একই কথা সে বলেছিল এবং বলে মানুদার ঝাড়ি খেয়েছিল। মানুদা কাশির শব্দ শুনে তার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকালেন।

এদিকে বায়েজিদ রিকশাভাড়া শোধ করবার কথা পুরোটাই ভুলে গেছে।

রিকশাওয়ালা বাইরে অপেক্ষা করছে অধৈর্য হয়ে। এতক্ষণে সে আরেকটা খ্যাপ পেয়ে যেত।

মুক্তি এলো তখন। আজকে আসতে তার দেরি হয়ে গেছে। মানুদা তাকে নিশ্চিত বকাঝকা করবে। মুক্তি মনে-মনে রিহার্সাল দিচ্ছে কী বললে মানুদা তাকে আর বকতে পারবেন না।

আপা, আপনি ভিতরে যাইতেছেন, আমার ভাড়াটা দিবার কন না? রিকশাওয়ালা বলল মুক্তিকে।

মুক্তি চমকে উঠল—আপনার ভাড়া দেয়নি? কে আসছে?

রিকশাওয়ালা বলল, বায়েজিদ ভাই আসছে।

কতটাকা ভাড়া?

৫ টাকা।

স্টেশন রোড থেকে তো ৫ টাকা ভাড়া হয় না।

রেজা স্যারের বাড়ি গিয়া যে তাকে আনলাম।

আচ্ছা।

মুক্তি তার ব্যাগ হাতড়ে ৫ টাকার একটা কয়েন বের করে রিকশাওয়ালার হাতে দিয়ে দিল। তারপর দ্রুত ঢুকে গেল তাদের দপ্তরে।

সবাই তাকে একনজর দেখে নিল।

মুক্তি গিয়ে বসল বায়েজিদের পাশে। আমার দেরি হয়ে গেল। তারপর বায়েজিদের কানের কাছে মুখ এনে বলল, ভাড়া দিছিস?

বায়েজিদ চাপাস্বরে বলল, কী?

রিকশাভাড়া।

এ আল্লা। একদম ভুলে গেছি...বায়েজিদ হাঁটুর ওপরে বসল। এবার সে উঠবে।

মানুদা কপালে বিরক্তির রেখা ফুটিয়ে বললেন, এই কোনো সাইড টক না। দেরি করে এসেছ। আবার সাইড টক! মুক্তি দেরি হলো কেন?

সবাই নীরব।

বায়েজিদ বলল, রিকশাভাড়াটা দিতে ভুলে গেছি...

বায়েজিদ উঠে পড়ল। মুক্তি বলল, আমি দিয়া দিছি।

বায়েজিদ বসল।

মানুদা গম্ভীরস্বরে বললেন, স্যার এসেছেন। আমরা তার সামনে গোটা স্ক্রিপ্টটা একবার পড়ব। ক্যারেক্টার ধরে ধরে পড়ব।

ঠিক আছে স্যার আপনি যদি বলেন শুরু করি।

ছোট্ট কাপের নিচে জমে থাকা কনডেন্সড মিল্কের মিষ্টি দ্রবণটা মুখে নিয়ে রেজা স্যার সম্মতি দিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু করে দাও। রক্তকরবী করছ তোমরা? না?

মানুদা বললেন, জি স্যার।

কে কোন ক্যারাক্টার করছ?

মানুদা বললেন, আমি স্যার করছি রাজা। বায়েজিদ করবে বিশু। আর মুক্তি নন্দিনী।

এই বায়েজিদ। প্রথমটা পড়ো।

বায়েজিদ রক্তকরবীর একটা ফটোকপি করা পাতা থেকে পড়তে আরম্ভ করল : *এই নাট্যব্যাপার যে নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিক দল মাটিরতলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে। নন্দিনী ও কিশোর (সুড়ঙ্গ খোদাইকর বালক)*

প্রথম ডায়লগ কিশোরের। কিশোর করবে স্বপন। ও আসেনি। ক্লাস নাইনে পড়া স্বপনের বোনের গায়ে হলুদ হচ্ছে। ও আসতে পারবে না। মানুদা বললেন, বায়েজিদ, চালিয়ে নাও। বায়েজিদ স্বপনের হয়ে প্রক্সি দিতে লাগল। নন্দিনী মুক্তি উপস্থিত আছে। মুক্তি প্রথমে একটু জড়তাসমেত পরে স্বচ্ছন্দে নন্দিনীর সংলাপগুলো বলে যেতে লাগল—

কিশোর : নন্দিনী! নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী : আমাকে এত করে ডাকিস কেন কিশোর! আমি কি শুনতে পাইনে?

কিশোর : শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তাহলে আনতে যাই।

নন্দিনী : যা, যা, কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।

কিশোর : সমস্ত দিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্য ফুল খুঁজে আনতে পারলে যে বেঁচে যাই।

নন্দিনী : ওরে কিশোর জানতে পারলে যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর : তুমি যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজে এক জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী : আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে ফুল তুলে আনব।

কিশোরা : অমন কথা বোলো। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হয়ো না। ঐ গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাবো, এ আমার নিজের ফুল।

নন্দিনী : এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার বুক ফেটে যায়।

কিশোর : সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী : কিন্তু তোদের এই দুঃখ আমি সইব কী করে?

কিশোর : কিসের দুঃখ! একদিন তোমার জন্য প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে-মনে ভাবি।

বায়েজিদ সংলাপ বলে যায়। এটা কিশোরের সংলাপ। সংলাপ বলবে স্বপন আচার্য্য। ১৫/১৬ বছরের সত্যিকারের কিশোর। এখন বায়েজিদ তাকে প্রক্সি দিচ্ছে মাত্র। কিন্তু বায়েজিদ এত দরদ দিয়ে সংলাপ বলছে যেন মনে হচ্ছে সে সত্যি সত্যি মরতে পারে নন্দিনীর জন্যে। নন্দিনীর জন্যে, নাকি মুক্তির জন্যে! মানুদার ভেতরে এই ধরনের একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল।

মহড়া চলছে। স্বরবর্ণ থিয়েটারের মহড়াকক্ষ কাম দপ্তরের খোলা জানালায় সাধারণ লোক ভিড় করে আছে। নাটক দেখতে লোকে যায় না। তবে জানালা খোলা রেখে রিহার্সাল করলে লোক হয়। টাউন হলের পেছনে এই দপ্তর। পাশে শিল্পকলা একাডেমী। সামনে মাঠের একদিকে পাবলিক লাইব্রেরি। শহীদ মিনার। তারপর মাঠ। উন্মুক্ত মঞ্চ। জায়গাটা রংপুরের সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান। তারই পাশে মিউনিসিপ্যালিটি কার্যালয়। ধাঙ্গড়দের পদভারে সারাক্ষণ জায়গাটা সরগরম থাকে। ধাঙ্গড়রাও শিল্প-প্রেমিক কম নয়। রিহার্সাল শুরু হতে না হতেই দু-একজন ঝাড়ুদারনি এসে জানালার পাশে দাঁড়ায়। তাদের কালো কালো ছোট ছেলে মাথাভর্তি চুল নিয়ে মাটিতে পড়ে থাকে আর অখাদ্য মুখে দেয়। রক্তকরবী নাটকটা কি তারা বোঝে? চন্দ্রা বা ফাগুলাল চরিত্রগুলোর সঙ্গে কি তারা একাত্মতা অনুভব করে? রেজা স্যার ভাবেন। প্রতিটা শিল্পই আসলে সীমাবদ্ধ। সবার জন্যে সবকিছু নয়। এই যে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, এই নাটকটাই কি রেজা স্যার ঠিকমতো বোঝেন! কী জানি? আমি আমার মতো বুঝি। আমার মতোই বুঝব। আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো লাল। আমি যেমন বুঝব রক্তকরবী তেমনই।

পড়া চলছে। নন্দিনী যে করছে, মুক্তি, সে মোটামুটি। বায়েজিদ খুবই ভালো করছে বিশুর চরিত্র। সবচেয়ে হতাশ কিন্তু করলেন মানুদাই। রাজার সংলাপগুলো তিনি দেখে দেখে পড়লেন। তবুও আটকে আটকে গেলেন। সবার দিকে নজর দিতে গিয়ে তিনি বোধহয় নিজের সংলাপগুলোর দিকে নজর দিতে পারেন নাই। তাই হয়। যে রাঁধে তার নিজের খাওয়া ভালো হয় না।

বিশু : ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায়?

ফাগুলাল : তুমি কী করে এলে?

বিশু : আমাদের কারিগররা বন্দিশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ঐ চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়?

ফাগুলাল : সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু : কোথায়?

ফাগুলাল : শেষ মুক্তিতে—বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে?

বিশু : ও যে রঞ্জন।

ফাগুলাল : ধুলায় দেখেছ ঐ রক্তের রেখা?

বিশু : বুঝেছি। ঐ তাদের পরম মিলনের রক্তরাখী। এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার। হয়তো গান শুনতে চাইবে। আমার পাগলি। আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল।

ফাগুলাল : নন্দিনীর জয়।

বিশু : নন্দিনীর জয়।

ফাগুলাল : আর, ঐ দেখো, ধুলায় লুটাচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান হাত থেকে কখন খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু : তাকে বলেছিলুম তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল—তার শেষ দান।

সংলাপ শেষ হতে না হতেই হারমোনিয়ামে সবাই মিলে গান ধরে ফেলল : *পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে, আয় আয় আয়...*

গান শেষ হলো। রক্তকরবী পড়াও শেষ হয়ে এলো। এরই মধ্যে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে এসেছে। কুয়াশা আর শীত জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে রংপুর শহরের সোডিয়াম আলো মাখা ফুটপাথগুলোয়।

রেজা স্যারের দিকে তাকিয়ে মানুদা বললেন, স্যার কেমন লাগল বলুন। এখনও তো স্যার প্রিলিমিনারি পর্যায়ে আছে।

রেজা স্যার বললেন, প্রিলিমিনারি পর্যায়ে আছে, না? নানা ভালো হয়েছে।

মানুদা বললেন, আরও স্যার ইম্প্রোভাইজ করব। এই মিজান চা দাও না ভাই।

মিজান ফ্লাস্ক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চা দিয়ে দিয়ে কাপ ধুয়ে সে সবাইকে চা দিচ্ছে।

রেজা স্যারের মনে হলো, বলেন, তোমাদের মহড়া দেখে আমার যে জিনিসটা ভালো লাগল, তোমাদের এই নাটকের সবচেয়ে ভালো যে দিক, তা হলো এর পাণ্ডুলিপি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকটা ভালো লিখেছেন। খুব ভালো। কিন্তু এ কথাটা কি আর বলা যায়? তবে সবচেয়ে মুগ্ধ তিনি হয়েছেন মুক্তি নামের এই মেয়েটিতে। সে যে অভিনয় খুব ভালো করেছে, তা নয়, সংলাপ এখনও হেফজ হয়নি, কিন্তু মোটের ওপরে মেয়েটা দারুণ। আর দেখতে কী রকম সুন্দর। ধবধবে ফর্সা, ঠোঁট দুটো গোলাপি, এত বড় কালো চুল, ভাসাভাসা চোখ, এই শহরে এই রকম একটা মেয়ে ছিল কোথায়?

রেজা স্যার বললেন, তোমাদের মিউজিক তো বেশ ভালো হচ্ছে। গানগুলো বেশ ওয়েল রিহার্সড, নাকি?

জি স্যার। ওরা তো আগে থেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় স্যার। মানুদা হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, অভিনয় কেমন লাগল? (বায়েজিদের মনে হলো, মানুদা যেভাবে হাত কচলাচ্ছেন, হাতের ছাল না শেষে উঠে যায়)

রেজা স্যার বললেন, ভালো। সবাই তো বেশ ভালো করেছে। তোমার নাম কী? তিনি ওই ঘর আলো করে থাকা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললেন।

শারমিন আক্তার মুক্তি।

তোমার অভিনয় তো বেশ ভালো। তবে কণ্ঠস্বর বেশি চড়াতে পারবে তো? টাউন হলে তো শেষ সিট পর্যন্ত সাউন্ড পৌঁছাতে হবে। খালি গলায়...

মানুদা বললেন, নতুন এসেছে তো স্যার দলে। ওকে গলার এক্সারসাইজগুলো দিয়েছি। করলেই গলা পোক্ত হবে।

রেজা স্যার বললেন, আমার আরও খানিকটা বসতে ইচ্ছা করছে। তবে আজকে আর পারব না। তোমাদের সাথে আমার আরও বসতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন রক্তকরবী লিখেছিলেন, এর ব্যাখ্যা কী, এসব নিয়ে আলোচনা করা দরকার। ব্যাপারটা বোঝা থাকলে অভিনয়টা আপনা-আপনিই প্রাণের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে। আজকে তাহলে আসি। বুঝলে না ছোট ভাইটার ভায়রার ছেলের আকিকা...খুব করে ধরেছে...

মানুদা উঠলেন, চলুন স্যার। আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। এই শোনো

রিহার্সাল শেষ। যার যার কাজ আছে, চলে যাও। কালকে আবার বিকাল সাড়ে ৫টায় কল। মুক্তি তুমি যাবে না। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। বায়েজিদ, তুমি একটা রিকশা পাও নাকি দেখো তো...

স্যারের সঙ্গে সঙ্গে মানুদা বায়েজিদ সবাই বাইরে গেল। এখানে ঘটল একটা মজার ঘটনা। রাস্তার একটা টোকাই এতক্ষণ জানালা দিয়ে রিহার্সাল দেখছিল, সে খুব সুন্দর করে একটু আগে বলে যাওয়া নাটকের সংলাপ একবার নারী কণ্ঠে একবার পুরুষের কণ্ঠে অভিনয় করে দেখাতে লাগল। তার অভিনয় দেখে সবাই হাসে।

'নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী।'

'আমাকে এত করে ডাকিস কেন কিশোর। আমি কি শুনতে পাই নে।'

'শুনতে পাস জানি। কিন্তু আমার যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার, তাহলে আনতে যাই।'

রোজ মহড়া দেখতে-দেখতে ছেলেটার সংলাপগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে। রেজা স্যার বললেন, অল দি ওয়ার্ল্ড ইজ আ স্টেজ অ্যান্ড অল দি মেন অ্যান্ড উমেন মেয়ারলি প্লেয়ারস। মানুদা এবার বিরক্ত হলেন। শেক্সপিয়ার কথাটা এই অর্থে বলেননি। শেক্সপিয়ারের কথাটার সরল সোজা অর্থ হলো, ঈশ্বর নাট্যকার, দুনিয়াটা মঞ্চ, আর আমরা সবাই যে যার ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছি। স্যারকে বলবে নাকি কথাটা। না থাকুক।

মানু, একটু শোনো তো। তিনি মানুকে নিয়ে পাবলিক লাইব্রেরির মাঠের দিকে সামান্য অন্ধকারের নিচে নিয়ে গেলেন, বললেন, মুক্তি মেয়েটা কে বলো তো! চোখ দুটো তো খুব এক্সপ্রেসিভ। ওর তো খুব সম্ভাবনা। বাসা কোথায়?

মানুদা বললেন, কেরানিপাড়ায়। ওই যে স্যার হাফিজ সাহেবের ছোট বোন। আরে ওই যে ডিশ হাফিজ। ওর মাকে তো আপনি চিনবেন স্যার। হায়দার মিয়ার ভাগ্নি মোরশেদা।

ও হায়দার মিয়ার ভাগ্নি তা ওর মা না ডেলিভারির সময় মারা গেল।

জি স্যার। মুক্তির মা ওকে জন্ম দিয়েই মারা যান। বড়ভাইয়ের কাছে আছে এখন।

রেজা স্যার তার দুঃখটা মাঠের চোরকাঁটা সমাবেশের দিকে ছড়িয়ে দিতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, আহা রে। দুখী মেয়ে!

বায়েজিদ একটা রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখেছে। রেজা স্যার রিকশায় উঠে বসলেন। তার পাশে বসল বায়েজিদ।

রিকশা চলতে লাগল। রংপুর শহরে রাতের বেলা রিকশার নিচে হ্যারিকেন

জ্বালানো বাধ্যতামূলক।

রেজা স্যারদের রিকশার নিচের লণ্ঠনের আলোর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মানুদা।

তারপর দ্রুত পদবিক্ষেপে ফিরে এলেন দপ্তরে। মুক্তি মেয়েটা আজকে দেরি করে এসেছে। এসব অনিয়মকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাহলে গ্রুপ টিকবে না। গ্রুপ করতে হলে ডিসিপ্লিন দরকার। আর দরকার সবার সমান মর্যাদা। কাউকে ছোট কাউকে বড় করে দেখলে গ্রুপ টেকে না।

মুক্তি একা বসে আছে। দপ্তর সম্পাদক শাহিন শতরঞ্জি গোটাচ্ছে। দলের অন্যরা একজন দুজন করে বেরিয়ে গেছে যে যার মতো।

মানুভাই এসে বসলেন মুক্তির সামনে। গলা যথাসম্ভব শীতল করে বললেন, মুক্তি। দেখো আমরা এখানে গ্রুপ থিয়েটার করতে এসেছি। ফাজলামো করতে আসি নি। তুমি নায়িকা হয়ে গেছ নাকি? ম্যাডাম বলে ডাকতে হবে? ছাতা ধরে থাকতে হবে। আমরা গ্রুপ থিয়েটার করছি। এটা আমাদের কমিটমেন্ট। কমিটমেন্ট হিসাবেই এটাকে দেখতে হবে।

মুক্তি এই মুহূর্তটার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল। সে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, আমার বাসায় একটু সমস্যা হইছে মানুভাই।

সমস্যা। বাইরের গেস্ট নিয়ে এসেছি। রেজা স্যার এসে বসে আছেন। আজকে যদি এটা শো হতো? তোমার জন্যে আমরা শো বন্ধ রেখে বসে থাকতাম?

মুক্তি মিনমিন করে বলল, আর হবে না।

মানুদার রাগটা ভেতর থেকে আসতে শুরু করেছে, তিনি ধমকে বললেন, যাও।

গলার ব্যায়াম দেবেন না?

না যাও তো। আবার গলার ব্যায়াম।

মুক্তি কেঁদে ফেলল। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে।

মানুদা সেই জলের দিকে তাকালেন। টিউব লাইটের আলোয় মেয়েটাকে আরও ফরসা দেখা যাচ্ছে। চোখের নিচে পানির ফোঁটা জমে আছে। মেয়েটাকে দেখতে লাগছে অপরূপ। কিন্তু রূপে মুগ্ধ হবার সময় এটা নয়।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার মনে হলো, তিনি রক্তকরবীর রাজা। তাকে ঘিরে ধরছে জাল। এই জালের বাইরে বেরুনো তার পক্ষে উচিত হবে না।

তিনি ধাতবগম্ভীর স্বরে বললেন, যাও। রাত হয়ে এসেছে।

শাহিন জানালা বন্ধ করছে। মুক্তিও চোখ মুছে হাত শতরঞ্জি গোটাতে লাগল। মানু ভাই খাতাটা রেখে আলমারি বন্ধ করলেন।

মুক্তি বাইরে গেল। মানুদা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। শাহিনকে বললেন, তাড়াতাড়ি তালা লাগাও। আমার কাজ আছে।

বাইরে মুক্তি শিল্পকলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মানুদা সাইকেলের তালা খুলে এগিয়ে গেলেন মুক্তির কাছে। বেশ রাত হয়ে গেল। একা যেতে পারবে?

মুক্তি বলল, পারব।

দাঁড়াও। আমি তোমাকে দিয়ে আসছি।

লাগবে না।

কী ব্যাপার, তুমি এখনও কাঁদছ, ব্যাপার কী?

ভাবির বুকে ব্যথা উঠছে। তাকে ক্লিনিকে নিয়া গেছে।

এজন্য দেরি হয়েছে?

জি।

স্যরি। সেটা আগে বলবে না।

মুক্তি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মানুভাই। কণ্ঠস্বরের ব্যায়ামটা দিবেন না?

মানুদা বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, তুমি কি আমাকে অমানুষ ভাবো নাকি? তোমার ভাবি হসপিটালে, এখন আমি তোমাকে দেব গলার ব্যায়াম। তুমি এখন বাসাতেই যাবে তো?

হ্যাঁ। ভাবি নাই। সবকিছু আজকে আমাকে সামলাতে হবে।

তাহলে তুমি রিকশা নাও। আমি তোমাকে সাইকেলে করে তোমার বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

শাহিন ব্যাপারটার ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক। সে ভেবেছিল, মানুদা সাইকেল নিয়ে চলে গেলে মুক্তিকে সে রিকশা ঠিক করে দেবে। মুক্তির সঙ্গে সে এক রিকশায় চড়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্য সে কল্পনাও করতে পারে না বটে, তবে সে তাকে রিকশা ভাড়া করে দিচ্ছে, এটা তো ঘটতেই পারে।

কিন্তু মানুদা নিজেই যখন ব্যাপারটা করছেন, তার আর থাকার মানে হয় না। শাহিন বিদায় নিল।

মুক্তি যাচ্ছে রিকশায়। মানুদা সাইকেলে।

মুক্তি মনে-মনে প্রমাদ গোনে। কারণ, একটু আগে সে মিথ্যা কথা বলেছে। বলেছে তার ভাবির অসুখ। ভাবি হাসপাতালে। এখন মানুদা গিয়ে যদি বাসায় ঢুকে পড়েন, তাহলেই দেখতে পাবেন, ভাবি বাসায়, বহাল তবিয়তে আছে। যে করেই

হোক, মানুদাকে গেট থেকে বিদায় দিতে হবে।

গেটে এসে মানুদা বললেন, আমি যাই।

মুক্তি বলল, বাসায় কেউ নাই তো। তাই আপনাকে আজকে আর বসতে বলব না। আদাব মানুদা। মুক্তি যেন মানুদাকে তার ফেরার পথটা দেখিয়ে দিল।

মানুদা সাইকেলে উঠে আবার অন্ধকার গলিপথ পেরুতে লাগলেন।

গলির মুখে আলো আছে। সেই আলোয় মানুদা দেখতে পেলেন, বায়েজিদ যাচ্ছে মুক্তিদের বাসার দিকে। ব্যাপার কী? তিনি সাইকেল থামিয়ে মোড়ের মুদি দোকানে দাঁড়ালেন। অকারণে একটা কয়েল কিনলেন। আর কী কী করা যায় সময় কাটানোর জন্যে, ভাবতে ভাবতে একটা খিলিপান কিনে মুখের মধ্যে পুরলেন।

বেশ খানিকটা সময় অকারণেই ক্ষেপণ করলেন। তার চোখ গলির দিকে। বায়েজিদ সেই যে গেল মুক্তির বাড়ির দিকে, ফিরল না তো। এই দুজনের গতিবিধি তার কাছে ভালো লাগছে না। তার কাছে থিয়েটারটাই বড়। মানুষে মানুষে সম্পর্ক নয়। আজকে যদি বায়েজিদ আর মুক্তিকে নিয়ে কোনো কথা শুরু হয়, কানাঘুঁষা শুরু হয়, মুক্তির পরিবার যদি ওকে আর বাইরে বের হতে না দেয়, তখন? মুক্তি তো শুধু একা নয়, আরও আরও মেয়ে আছে তার দলে। প্রেম-প্রীতি করতে গিয়ে শহরের আর্ট-কালচারের বারোটা বাজুক, এটা তিনি হতে দিতে পারেন না।

বিষণ্ন মন নিয়ে মানুদা সাইকেলে উঠে পড়ে প্যাডেলে চাপ দিতে লাগলেন।

তার মনটা নানা বাজে চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল। খালি বাড়িতে মুক্তিকে পেয়ে বায়েজিদ আবার খুব বেশি দূর অগ্রসর হবে না তো! আজকালকার ছেলে-মেয়েদের কোনো বিশ্বাস নাই। কোনোই বিশ্বাস নাই।



বায়োজিদ মুক্তির বাসায় গিয়ে বারান্দায় উঠে ডোরবেলে চাপ দিল। দরজা খুলল মুক্তিই। বায়েজিদকে দেখে সে চোখে-মুখে আনন্দমিশ্রিত বিস্ময় ফুটিয়ে বলল, বায়েজিদ ভাই, তুই?

বায়েজিদ মেরুন রঙের পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ল ওদের ড্রয়িং রুমে। তোর রিকশাভাড়াটা দিতে আসলাম।

এখনই দিতে হবে?

মুক্তি তুই আসলি কিভাবে?

মানুদা দিয়া গেল।

বাহ্ বা মানুদার কাণ্ডজ্ঞান আছে তো। তোকে আসলে মানুদা পছন্দই করে। এইজন্যে তোর উপর আলগা রাগ দেখায়।

আরে কত বড় একটা মানুষকে নিয়া এসব কি বলতেছিস?

ভাবি কই?

আছে কোথাও। শোন, মানুদাকে বলবি না। মানুদাকে বলেছি ভাবি ক্লিনিকে। দেরি হইছে বলে কী রকম বকাবকি করতেছিল। রেডিওতে যে নাটক করছিলাম, সেটার একটা ডায়লগ ছিল। কান্নার ডায়লগ, ভাবি ক্লিনিকে, মুখস্থ বলে দিলাম। মানুদা ধরতে পারে নাই। বল আমি অভিনেত্রী খারাপ?

কী বলতেছিস তুই? আমি যদি মানুদাকে বলে দেই?

না বলবি না।

তোর রিহার্সালে যাইতে দেরিটা হইল কেন শুনি?

আরে বায়েজিদ ভাই। তুই চলে গেলি। তারপর গোসল করলাম। কতদিন চুল ভিজাই না। চুল আঠা আঠা হয়ে গেছল। শ্যাম্পু করলাম।

মুক্তির ভাবি এলেন। বয়স ৩২/৩৩ হবে। ভদ্রমহিলাও সুন্দরী আছেন। তবে মুখে মেছতা পড়ে গেছে। তিনি পর্দা তুলে বললেন, মুক্তি, কে রে?

মুক্তি বলল, বায়েজিদ ভাই।

ভাবি এগিয়ে এলেন। কী বায়েজিদ। ইদানীং তুমি নাকি বিজনেসম্যান হইয়া গেছ?

বায়েজিদ বলল, আরে ভাবি আসেন। কেমন আছেন। বিজনেসম্যান না, একটা ওষুধের দোকান দিছি। আপনি ভালো আছেন?

আছি। তোমার আম্মার শরীরটা ভালো?

আছে ভাবি... বোঝেনই তো বয়স হইছে।

হ্যাঁ। সেই তো...আমারও তো শরীর বেশি ভালো না... সেইদিন রাতের বেলা তো বুক এমন জ্বলতে লাগল।

ও। এসিড। সবার এসিড।

চা খাইছ?

না। গ্রুপে চা খাইছি তো আর খাইতে চাই না। যাব। আমার আবার কাজ আছে। দোকানে আজকা ওষুধ ডেলিভারি আসবে। আপনার জন্য আমি ভালো এন্টাসিড দিয়া যাব।

দিও তো।

ভাবি ভেতরে গেলেন।

বায়েজিদ বলল, রেজা স্যারকে তোর কেমন লাগল?

মুক্তি বলল, কেমন আবার। উনি যে রকম।

বায়েজিদ বলল, আমার মনে হয় রেজা স্যার এখন থেকে রেগুলার আসবে রিহার্সাল দেখতে।

ক্যান এইটা মনে হইতেছে তোর?

আমার একটা সিক্সথ সেন্স আছে। দেখিস আসবে।

মুক্তি না বোঝার ভান করল। কিন্তু সে বুঝতে পারছে বায়েজিদ কী বলতে চায়। তার নিজেরও ধারণা রেজা স্যার আবার আসবেন। রেজা স্যারের চোখে সে মুগ্ধতা দেখতে পেয়েছে।



মানুদা বায়েজিদকে ডেকেছিলেন। পাণ্ডুলিপির ফটোকপি করতে হবে। এ ছাড়া পোশাক পরিকল্পনা আর মঞ্চ পরিকল্পনা নিয়েও কিছু-কিছু ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ করা দরকার। বায়েজিদ যেন তার বাসায় আসে।

মানুদা অকৃতদার। লালকুঠির ভেতরে একটা সরকারি রুমে থাকেন। বাথরুমটা একটু দূরে। এক রুমের ঘরের পাশে একটা আঙিনা মতো আছে। আঙিনায় বরই গাছ।

তিনি নিজেই রাঁধেন। ব্রাহ্মণের ছেলে। রান্নার গুণটাই কেবল তার আছে।

মানুদা পাণ্ডুলিপি ছড়িয়ে বসে আছেন বিছানায়। লাল মেঝে, সাদা লোনা ধরা দেয়াল। এককোণে একটা সিঙ্গেল খাট। সাদা চাদরে ঢাকা। তারই ওপরে পাণ্ডুলিপি ছড়ানো। জানালা দিয়ে তেরসা হয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। খানিকটা মেঝেতেও। মানুদার টাকের নিচে কপালে ভাঁজ। এতগুলো চরিত্র। কার পোশাক কী হবে?

বায়েজিদ বলল, মানুদা, আমার ক্যারেক্টার তো ঠিকই আছে, কী বলেন। আমি বিশু...

মানুদা তার দিকে না তাকিয়ে হাতের ডায়েরিতে আপন মনে নোট নিতে নিতে বললেন, না ক্যারাক্টার ঠিক নেই। তোমাকে কালকে দেখলাম তুমি মুক্তিদের বাড়ির দিকে যাচ্ছ।

চিন্তা করো। আমি মুক্তিদের বাড়ি গেছি না যাই নাই, এই দিকেও তার নজর। নিশ্চয়ই কালকে উনি আমার গতিবিধির ওপরে নজর রাখছিলেন। অস্বীকার করার উপায় নাই। বায়েজিদ পরিস্থিতি সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, হ্যাঁ ঠিক দেখেছেন।

শোনো, এভাবে হুট করে কারো বাসায় যাওয়াটা ঠিক না।

হুট করে মানে?

একটু আগেই তার সাথে তোমার দেখা হয়েছে। ১০ মিনিটের মাথায় কী এমন ঘটল যে তার বাসায় গিয়ে তোমাকে হাজির হতে হবে?

আমি কেন গেলাম। মুক্তি তখন আমার রিকশাভাড়া দিয়া দিছিল। এরপর ও কেমন করে গেল, আমি রিকশাভাড়াটা শোধ করলাম না, তাই গেলাম। টাকাটা ফেরত না দিলে অন্যায় হইত।

দিয়েছ টাকা?

দিয়েছি।

ভালো করেছ। ওর ভাবি এখন কেমন আছে জানো কিছু।

না জানি না তো। আমি শুধু গেলাম, টাকা দিলাম চলে আসলাম।

তুমি কি ঠিক বলছ।

জি ঠিক বলছি।

কিন্তু আমি তোমার সাথে একসঙ্গে ফিরব বলে প্রায় ১৫ মিনিট রাস্তার মোড়ের দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুমি তো ও বাসা থেকে বের হও নি। বাসায় তো ওর ভাবিও ছিল না। তিনি ছিলেন ক্লিনিকে...

আমি তো টাকা দিয়ে সাথে সাথেই বের হলাম। কই আপনাকে দেখলাম না তো।

কী জানি। হয়তো আমি লক্ষ্য করি নি। শোনো তুমি আবার অন্য কোনো কিছু ভেবো না। আসলে থিয়েটারটা হলো আমাদের কমিটমেন্ট। এখানে প্রতিটা সদস্যের কমিটমেন্ট চাই। আর মেয়েদের সম্পর্কে আমাদেরকে নানাভাবে কেয়ারফুল থাকতে হবে। মেয়েদের যেন আমরা অসম্মান না করি। একবার বদনাম হয়ে গেলে আর কেউ আসবে না। ঠিক আছে। বুঝেছ তো?

জি।

এখন বলো। কালকের রিহার্সাল দেখে তোমার কী মনে হলো?

প্রসঙ্গ বদলে যাওয়ায় বায়েজিদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, ফাটাফাটি ... ফাটাফাটি ডিরেকশন। শুধু কয়েক জনের অভিনয় খারাপ।

মানুদা গলায় দরদ ফুটিয়ে বললেন, তোমার ওপরে কিন্তু আমি অনেকটা ভরসা করে রেখেছি। কিন্তু দেখো ডুবিও না। নিজেকে অন্য কোনো কাজে ইনভলভড করো না।

ওষুধের দোকানে যাবো না বলতেছেন?

আরে না। ওষুধের দোকানের কথা হচ্ছে না। আর্ট জিনিসটা হবে আর্টিস্টের প্রথম ভালোবাসা। আর্ট কখনও সতীন সহ্য করে না। তুমি তোমার প্রেমিকা ছেড়ে দাও, একবার না একবার সে তোমার কাছে ফিরে আসবে, কিন্তু তুমি আর্টকে হেলাফেলা করেছ তো তা আর কখনও তোমার কাছে ফিরে আসবে না। বুঝলে?

মনে হয়...

মনে হয় কী?

বুঝতে পারছি।

ক্যারেক্টারাইজেশনটা ঠিকমতো করতে হবে। পারবে না?

পারব।

মনটাকে শাসন করবে। চঞ্চল হয়ো না।

আমার মনে হয় আপনি কী বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝেছি।

বায়েজিদের না বোঝার কোনো কারণ নেই। এইসব থিয়েটার-ফিয়েটারের দিকে বায়েজিদের তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। সে তার বন্ধুদের সামনে সময় কাটানোর জন্যে থিয়েটারে যাওয়া শুরু করেছিল। কিন্তু যেদিন থেকে মুক্তি মেয়েটা আসা শুরু করল, সেদিন থেকে সবকিছু পাল্টে যেতে লাগল। মানুদাই এনেছিলেন মুক্তিকে। মুক্তির বড় ভাইকে অনুরোধ করে বলেছিলেন, আপনার বোনটাকে দিন। ওর চোখ দেখেই বুঝেছি ওর দ্বারা হবে। আমি ভাই বহুদিনের পুরোনো জহুরি। নিজের সোনাদানা না থাকতে পারে, খাঁটি সোনা চিনি। ওকে দিন।

ডিশ হাফিজের ডিশ এন্টেনার ব্যবসা। বোনকে নাটক করতে দিতে তিনি রাজি হয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন তিনিই জানেন। বায়েজিদের ধারণা, বাসায় বসে থাকার চেয়ে মুক্তি পাক। ছেলেপুলেদের সঙ্গে পরিচয় হলে বিয়েটা আপনা-আপনিই হয়ে যাবে। এই ছিল তার মতলবটা।



সত্যি সত্যি পরের দিনের রিহার্সালে রেজা স্যার আগে ভাগে হাজির হয়েছেন। কড়কড়ে মাড় দেওয়া ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি পরে। মানুদা তাকে পেয়ে খুবই খুশি।

রেজা স্যার বললেন, শোনো, আমি অনেক ভেবে দেখলাম মানু, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীটা তোমাদের আগে বুঝতে হবে। তিনি কেন এই নাটক লিখেছিলেন...

আপনি স্যার যদি একটা লেকচার দিতেন।

হ্যাঁ। আমি যতটুকু জানি যতটুকু বুঝি তোমাদেরকে বলি। তোমাদের ভাবনাটাও শুনলাম। তাই না?

রেজা স্যার বারবার দরজার দিকে তাকান। মুক্তি মেয়েটা তো কই আসছে না!

গানের ছেলেমেয়েরা এসে পড়েছে প্রায় সবাই। তারা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শুরু করল: পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয় আয় আয়...

মুক্তি এসে গেল। একটা সুতির কামিজ পরেছে মুক্তি, সাদা রঙের, জামা-ওড়না সব ফুলে ফুলে আছে, তাকে দেখাচ্ছে একটা সাদা পরীর মতো। রেজা স্যারের দম আটকে যায় যায় অবস্থা!

বায়েজিদসহ অন্যরাও এসে গেছে।

মানুদা বললেন, শোনো। স্যারকে আমরা আজকে পেয়েছি। স্যারের কাছে আমরা শুনি রক্তকরবী নাটকটা আসলে কী? রবীন্দ্রনাথ কেন এই নাটকটা লিখেছিলেন। কী বৃত্তান্ত।

রেজা স্যার কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে লাগলেন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩৩০ সালে গ্রীষ্মকালে নাটকটি লেখেন। তিনি তখন ছিলেন শিলং-এ। শিলং কোথায় জানো তো?

একজন বলল, মেঘালয়ে। সিলেট দিয়া ডাউকি বর্ডার দিয়া যাওয়া যায়।

রাইট। রেজা স্যার উৎসাহভরে বলতে লাগলেন, আমি গিয়েছিলাম। শিলং গেলাম। গিয়ে বললাম, আমাকে ওই বাড়িতে নিয়ে যাও যেখানে বসে রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী লিখেছিলেন। সেই বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে এখন এক বাঙালি ভদ্রলোক থাকেন। স্ত্রী সমেত। বাঙালি যারাই শিলং যায়, ওই বাড়িটা দেখতে যায়।

রক্তকরবীর একটা গাছও আছে বাড়িটাতে। তবে শিলংয়ের বর্ণনা যদি তোমরা পেতে চাও, তোমাদেরকে আরেকটা উপন্যাস পড়তে হবে। শেষের কবিতা। শেষের কবিতায় অমিতের মোটরগাড়ির সাথে লাবণ্যের গাড়ির ধাক্কা লাগে। যে পাহাড়ের ঢালুতে সেই দুর্ঘটনা হয়, শিলং-এর একটা রাস্তা দেখে আমার মনে হলো, এই সেই জায়গা।

তাই নাকি স্যার। সেই জায়গায় আপনি গেছলেন? মানুদার গলা থেকে অপার শ্রদ্ধা বেরিয়ে আসছে।

রেজা স্যার বললেন, আসলে তো *শেষের কবিতা* কাল্পনিক গল্প। কাজেই ওই রাস্তাতে এক্সিডেন্ট হয়েছিল, এটা ভাবা একেবারেই ভুল। তবু গল্পের সত্য জীবনের সত্য হয়ে দেখা দেয়। দিতে পারে। যেমন আমরা অনেকেই নাটোরে গিয়ে খুঁজি বনলতা সেনের বাড়ি কোনটা। আসলে তো এটা কবির কল্পনা মাত্র। নাটোরের কথা তিনি বানিয়ে লিখেছিলেন। এখন মনে হয় সত্যি সত্যি নাটোরে বনলতা সেনের বাড়ি আছে। তাই না?

মানুদা হা হয়ে গল্প শুনছেন। বায়েজিদের মনে হলো, মানুদার মুখের ভেতরে মশা ঢুকে যেতে পারে।

রেজা স্যার বলে চলেছেন, তোমরা জানো, রক্তকরবীর নাম আগে কী ছিল। আগে এর নাম ছিল যক্ষপুরী। লেখার দেড় বছর পরে ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে প্রবাসী পত্রিকায় যখন এটা ছাপা হলো, নাম দেয়া হলো রক্তকরবী। কী? শেক্সপিয়ার কী বলেছেন, নামে কীবা আসে যায়? তাই না।

তো বলো তোমরা এই নাটকটা তো তোমরা পড়েছ। মহড়া দিচ্ছ। কী মনে হয়? নাটকটার মানে কী?

কেউ কিছু বলে না।

কাদেরী প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রফ্রন্ট করে। সে বলল, স্যার এটা হলো পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের বিপ্লবের নাটক। রাজা হলেন পুঁজিবাদের প্রতীক। আর একদিন প্রজারা, মজুরেরা সবাই জেগে উঠল রাজার এই সিস্টেমের বিরুদ্ধে। তারা পুঁজিবাদের অবসান ঘটাল।

রেজা স্যার বললেন, হ্যাঁ। এই ব্যাখা দেওয়া যায়। তবে মুশকিল হলো, এই নাটকে রাজা নিজেই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায়, আর কুলিরা যাকে বলে ঠিক সচেতন শ্রমিক সমাজ, সেই রকম না। তবু তোমার ব্যাখ্যাটাই আমি নিচ্ছি। রাজা হলেন পুঁজিবাদী যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক। আর নন্দিনী হলো প্রেমের প্রতীক, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এই নন্দিনীর আনন্দ-স্পর্শ রাজা পান না তার লোভের মোহে, তার নিজের বানিয়ে তোলা নিজেরই যে ভাবমূর্তি, তার ঘেরাটোপে বন্দি থেকে,

সন্ন্যাসী পায় না তার ধর্মসংস্কারের কারণে, মজুররা পায় না কারণ ওরা তো যন্ত্র হয়ে গেছে, আফিমে ভোলা পাখি হয়ে গেছে, পণ্ডিতেরাও পায় না তাদের বিদ্যার অহঙ্কারের কারণে অন্ধ হয়ে। নন্দিনী আসার সঙ্গে সঙ্গে মৃত যক্ষপুরী যেন জেগে উঠল। সবার দেহে প্রাণের সাড়া পড়ে গেল। সবাই নন্দিনীকে পেতে চায়, তার কাজে লাগতে চায়। রাজা তাকে পেতে চাইলেন শক্তি দিয়ে। কিন্তু শক্তি দিয়ে তো প্রেম পাওয়া যায় না। আর সেই শক্তির উন্মত্ততায় রাজা খুন করলেন রঞ্জনকে। রঞ্জন কে? রঞ্জন হলো যৌবনের প্রতীক। শেষে সবাই মিলে লেগে পড়ল এই যক্ষপুরীর বন্দিশালাকে ভেঙে ফেলে মুক্ত জীবন গড়ে তুলতে। আসলে কি রঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে? না রঞ্জন মরে নি আসলে। যৌবন কি মরতে পারে? তাই তো নন্দিনী বলে, (রেজা স্যার তার হাতের কাগজ দেখে পাঠ করেন) বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি। আবার বলছে, মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে। ও কখনো মরতে পারে না। ও আবার আসার জন্য প্রস্তুত হবে, ও আবার আসবে।

রেজা স্যার বক-বক করেই চলেছেন। কেউ তার কথা মন দিয়ে শুনছে। কেউ শুনছে না। না শোনার দলে মুক্তি নিজেও আছে। সে হলো নন্দিনী। অধ্যাপক তার পেছনে ঘুরবেন। কিন্তু অধ্যাপকের তত্ত্বকথা মন দিয়েই যদি বা শুনবে, সে নন্দিনী কেন?

কিন্তু রেজা স্যার পুরো লেকচারটা তার চোখে চোখ রেখে দিয়ে চলেছেন। মুক্তিকে শোনার ভান করেই যেতে হয়।

বক্তৃতা শেষ করে আত্মমুগ্ধ রেজা স্যার থামেন। এর মধ্যে হয়ে গেছে এক পশলা চা।

রেজা স্যার বলেন, আমি আজকে উঠি। আবার আসা যাবে। শোনো, তোমরা কিন্তু আমার বাসায় আসতে পারো। আমি স্যারাক্ষণ বাসাতেই থাকি। কলেজ তো বন্ধ। তোমাদের যার যেখানে বুঝতে কষ্ট হবে, আমার সাথে আলাপ করতে পারো। আমাকে ভয় বা লজ্জা পাবার কিছু নাই।

বায়েজিদ রেজা স্যারকে এগিয়ে দিতে গেল।

মানুদা বললেন, শোনো, আমাদের এবারের প্রডাক্‌শনটা বেশ কস্টলি। আমাদের ফান্ডের অবস্থা খুব খারাপ। প্রপস কিনতে হবে। সেট বানাতে হবে। আমরা একটা সুভেনিয়ার বের করব। তার জন্যে বিজ্ঞাপন দরকার। তোমরা প্রত্যেকে বিজ্ঞাপনের ফরম নিয়ে যাও। দেখো, পাও কিনা। কোয়ার্টার পেজ বিজ্ঞাপন রেখেছি মাত্র ৫০০ টাকা। এটা অন্তত প্রত্যেকে একটা করে তো এনে

দিতে পারো। শাহিন, তুমি ফরমগুলো বিলি করে দাও তো।

শাহিন ফরম বিলি করতে লাগল।

মোনা বলল, মানু দা। আজকে তোর আর রিহার্সাল করতেছি না। তাহলে যাই।

মানুদা অনুমতি দিলেন। হ্যাঁ। যেতে পারো।

সবাই যাবার জন্যে উঠতে লাগল।

মানুদা মুক্তিকে বললেন, মুক্তি। তোমার ভাবির কী খবর?

ভালো মানুদা।

বাসায় নিয়ে এসেছে?

জি মানুদা। বাসায় নিয়ে এসেছে। তখনই এনেছে তো। ডাক্তাররা বলেছেন, তেমন কিছু নয়। এসিডিটির ব্যথা। আসি মানুদা।

মানুদার বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল। যাক, কালকে বায়েজিদ যখন গিয়েছিল মুক্তির বাসায়, মুক্তি তখন বাসায় একা ছিল না। তার ভাবিও ছিল।

মানুদার মনে হলো, বলেন, কালকের মতো তোমাকে আমি দিয়ে আসি বাড়িতে। কিন্তু বলতে পারলেন না। সঙ্কোচ বোধ হলো। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, আসো।

মুক্তি বেরিয়ে পড়ল।

মানুদা বসে আছেন। রেজা স্যারকে বিদায় দিয়ে এসে পড়ল বায়েজিদ। এসেই সে তাড়া লাগাল, মানুদা। আমার আর কী কাজ? আমিও যাই।

যাবে। আরে যাবেই তো। একটা কাজ করে যাও। এই একটা পাতা এখানে একটু কপি করে দাও।

বায়েজিদের মেজাজটা খিচড়ে গেল। তা সত্ত্বেও সে পাতাটা কপি করতে লেগে পড়ল।

বাইরে গেলেন মানুদা। থিয়েটার কক্ষের বাইরে। সেখানে দেখা গেল মুক্তি দাঁড়িয়ে আছে। আধো অন্ধকারে।

মানুদা কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, কী ব্যাপার মুক্তি যাও নি।

মুক্তি মনে-মনে বলল, হ্যাঁ চলে গেছি। বাসায় গিয়ে ভাত খাচ্ছি। মুখে বলল, জি না মানু দা।

কারও জন্যে অপেক্ষা করছ?

না মানুদা। কার জন্যে অপেক্ষা করব?

তাহলে দাঁড়িয়ে আছ যে।

বাসায় যেতে ইচ্ছা করতেছে না।

কেন? না-না, এটা ঠিক নয়।

মনে হচ্ছে আরও কাজ করি। থিয়েটারের কাজ।

তাই নাকি!

দেখি ভেতরে কী কাজ হচ্ছে?

মুক্তি দপ্তরের দিকে পা বাড়াল।

ঘরের ভেতরে টিউব লাইটের আলোয় বায়েজিদ একটা কী যেন লিখছে।

মুক্তি বলল, বায়েজিদ ভাই, কী করিস?

বায়েজিদ কোনো শব্দ না করে ঠোঁটে বিড়বিড় করে গালি ছুড়ে দিল শূন্যতায়, তারপর মুখে বলল, একটা গান কপি করি।

তোর হাতের লেখা তো সুন্দর...খানিকটা কাছে গিয়ে উপুড় হয়ে বলল মুক্তি।

হ্যাঁ তোর মতো।

আমার মতো মানে?

মুক্তার মতো। সবাই বলে। আমার হাতের লেখা মুক্তার মতো।

আমার নাম মুক্তা না। মুক্তি।

তোর ভাবিকে আমি শুনেছি মুক্তা বলতে।

সে ভাবি ডাকেন মাঝে-মধ্যে। আদর করে।

আমিও ডাকি।

তাই, না? আচ্ছা এই নে...

মুক্তির ব্যাগে একটা মুক্তার মালা ছিল। সে সেটা বের করে দিল বায়েজিদের হাতে।

বায়েজিদ বলল, এটা কী?

মুক্তার মালা।

এটা দিয়ে আমি কী করব?

গলায় পরবি।

কেন?

পর না। পর না। প্লিজ পর, প্লিজ পর।

বায়েজিদ স্বপ্নাবিষ্টের মতো করে পরে নিল মালাটা— তুই যে কী পাগলামি করিস না!

মুক্তি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আমার ঘাড়ে জিন আছে। আমি জিন পুষি ...হিহিহিহি

দরজার বাইরে এসে যমদূতের মতো এসে দাঁড়িয়েছেন মানুদা। মুক্তি লক্ষ করল। সে তরল গলায় বলল, মানুদা মানুদা, দেখেন দেখেন... বায়েজিদের গলায় মুক্তার

মালা... বায়েজিদের গলায় মুক্তার মালা....

মানুদা গম্ভীর হয়ে বললেন, তাতে কী হয়েছে?

মুক্তি বলল, মানু দা। আপনার কী হইছে? আপনি এত গম্ভীর কবে থেকে হলেন। বুঝলেন না মুক্তার মালা কার গলায় থাকলে জানি লোকে বলে... অমুকের গলায় মুক্তার মালা...

মানুদার প্রবাদটা মনে গেল—বান্দরের গলায় .... ও হো হো হো...সত্যি বায়েজিদ, মুক্তার মালায় তোমাকে সাংঘাতিক দেখাচ্ছে....সবার জন্যে সবকিছু না..হো হো হো...

মুক্তি খিলখিল করে হাসছে। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে। মানুদার মনে হতে লাগল, এই তো নন্দিনী। আমাদের এই যক্ষপুরীতে জীবনের ছোঁয়া। প্রাণের প্রাচুর্যে যে টলিয়ে দিতে পারে সবকিছু, এমনকি গম্ভীর রাজার পাথুরে প্রতিকৃতি।

মুক্তি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল মালাটা ফেরত নিয়ে। এরই মধ্যে বায়েজিদের সঙ্গে তার চোখে চোখে কথা হয়ে গেছে।

মানুদা দেখলেন, মুক্তি বাইরে গিয়ে একটা রিকশা নিল।

রিকশা রওনা না দেয়া পর্যন্ত মানুদা দাঁড়িয়ে রইলেন সেই দিকপানে চেয়ে।

রিকশা অন্তর্হিত হলে তিনি তাদের দপ্তরে ফিরে এলেন।

শাহিন ফিরে এসেছে। দপ্তর বন্ধ করার দায়িত্বটা সে বেশ ঐকান্তিকভাবেই পালন করে।

বায়েজিদ বলল, মানুদা, কাজ শেষ। আমি যাই। আব্বা আবার আমার জন্যে বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। হাটে যাব। সর্ষে কিনতে।

মানুদা বললেন, আচ্ছা।

বায়েজিদ বেরিয়ে রিকশা নিল। মানুদা দরজায় দাঁড়িয়ে খেয়াল করলেন—মুক্তি খানিক দূরেই রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বায়েজিদ গিয়ে নিজের রিকশা ছেড়ে দিয়ে মুক্তিরটায় উঠে পড়ল।



একদিন দুইদিন তিনদিন।

একদিন ঠিকই মানুদা দেখে ফেললেন দুজনকে। একসঙ্গে একই রিকশায়।

মুক্তি খেয়াল করে নাই। বায়েজিদ দেখল। বলল, মানুদাকে দেখলাম যাচ্ছে।

কই?

ওই তো সাইকেলে গেল।

ইস রে। কালকে যে কী নসিহত শুনতে হবে! আমি আর কালকে গ্রুপে যাবই না।

পাগলামো করিস না মুক্তি। কেন যাবি না? অবশ্যই যাবি।

পরের দিন স্বরবর্ণ থিয়েটারের মহড়া কক্ষে প্রতিফলিত হলো বায়েজিদের সঙ্গে লুকিয়ে একসঙ্গে রিকশায় মুক্তির বাড়ি ফেরার ব্যাপারটার প্রতিক্রিয়া।

মানুদা বললেন, মোনা।

মোনা তার চড়ুইপাখির মতো মিহি কণ্ঠে বলল, জি মানু ভাই।

আমি ভাবছি, নন্দিনী ক্যারেক্টারটা তোমাকে দিয়ে ট্রাই করাব। দেখো তো দেখি কী দাঁড়ায়...

মোনা এই প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, আমি? পারব?

মানুদা বললেন, আমার মনে হয় পারবে। আমাদের একজনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকাটা ঠিক না। হয়তো এমন দেখা গেল... শোর দিন সে আসতে পারল না...

সবাই গম্ভীর। মোনারটা যে হচ্ছে না, সেটা সবাই বুঝছে। মোনাকে দিয়ে নন্দিনী করালে হবে না, এটা স্পষ্ট। কিন্তু মানুদা এটা করছেন, অন্য কোনো কারণে। সবাই যে কারণটা অনুমান করতে পারছে তা নয়। কিন্তু একটা কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে, সেটা সবাই বুঝছে।

অধ্যাপকের সঙ্গে নন্দিনীর সংলাপ হচ্ছে।

অধ্যাপক : নন্দিনী যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী : কী অধ্যাপক?

অধ্যাপক : ক্ষণে-ক্ষণে চমক লাগিয়ে দিয়ে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়েই গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী : আমাকে তোমার কীসের দরকার?

অধ্যাপক : দরকারের কথাই যদি বললে, ঐ চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গ থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা কিছু ধন সব ঐ ধুলোর নাড়ির ধন—সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী : বারে বারে একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কেন অধ্যাপক...

বিপ্লবদা করছেন অধ্যাপক। তিনি রংপুরের একজন অত্যন্ত খ্যাতিমান অভিনেতা। তিনি কারও সাতেও নাই পাঁচেও নাই, শুধু ঠিক সময় মতো এসে নিজের পার্টটুকু করেন। তিনি পর্যন্ত মোনার সঙ্গে সংলাপ দিতে গিয়ে মনোযোগ হারিয়ে ফেলছেন। মোনাকে দিয়ে নন্দিনী করালে রক্তকরবী করারই দরকার নাই, তার মনে হচ্ছে।

মানুদা বললেন, ভালোই তো করল মোনা, তোমরা কী বলো। ভালো করল না?

শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি। কারও কাছে সম্মতিসূচক কোনো কিছু শুনতে না পেয়ে তিনি যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন, দেখি আরও কদিন রিহার্সাল করে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

তবুও কেউ কোনো কথা বলছে না দেখে তিনি বললেন, ও ভালো কথা। তোমাদেরকে যে এড ফরম দিয়েছিলাম, তার কী অবস্থা?

কামাল বলল, পাওয়া যায় না।

শাহিন বলল, আরে লোকজন মনে করে চাঁদাবাজ আসি গেছে।

মানুদা বললেন, বায়েজিদ?

বায়েজিদ বলল, মানুষের পকেট থেকে আটআনা বের করাও কঠিন।

মানুদা বললেন, তুমি তো দুই হাজার টাকার দায়িত্ব নিয়েছ।

বায়েজিদ বলল, সেটা আমি দিব। আমার নিজের ফার্মাসির নামেই দিব।

রহমান নামে একজন এসেছেন নতুন। তিনি বললেন, আমি কিছু বলতে চাই।

মানুদা বললেন, রহমান সাহেব, তিনি কিছু বলতে চান।

রহমান বললেন, আমি ১০ হাজার টাকার দায়িত্ব নিচ্ছি।

সবাই হাততালি দিল।

তবে আমার একটা সাজেশন আছে। সেটা আমি পরে মানুদাকে বলব। রহমান সাহেব তালি থামলে বললেন।

মুক্তি বলল, আমি গেলাম। আমার কাজ আছে।

মুক্তির মুখ অন্ধকার। মনে হচ্ছে তার মুখ বর্ষার কালো মেঘে ঢেকে গেছে। কারও কাছে কোনো জবাব প্রত্যাশা না করে মুক্তি উঠে বাইরে চলে গেল।

মুক্তি একা একা রিকশায় যাচ্ছে। তার খুবই কান্না পাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, আজকে মানুদা তাকে যে অপমানটা করলেন, কেউ কোনোদিন তাকে তা করে নাই। রিকশা চলছে। চোখের জল নাকের জল তার শাসন না মেনে বয়ে চলেছে। সে মনে-মনে ঠিক করল, মানুদাকে সে উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেবে।

সবাই চলে গেল। দপ্তরে এখন শুধু মানুদা। আর রহমান সাহেব। রহমান সাহেব লোকটা হাড় জিরজিরে। তবে তার কণ্ঠস্বর বেশ ভালো।

রহমান সাহেব বললেন, চলেন বাইরে সিগারেট খেতে খেতে বলি। এই রুমে তো আবার সিগারেট খাওয়া নিষেধ। মানুদা রহমান সাহেবের সঙ্গে বের হলেন। বলুন, কী কথা আপনার?

রহমান সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আমার সাজেশনটা হলো মেইন ক্যারেকটারটা আপনি মুক্তিকেই দিবেন।

আপনি এটা কি টাকার পূর্বশর্ত হিসেবে বলছেন? মানুদা গলায় জোর ফুটিয়ে নাটুকে কায়দায় বললেন।

না। আপনি এটা না করলেও টাকাটা পাবেন।

দেখেন রহমান সাহেব। আমরা এখানে গ্রুপ থিয়েটার করতে এসেছি। আমাদের একটা বড় আদর্শ আছে। এখানে গ্রুপ লিডারের কথা সবাইকে শুনতে হবে। ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে। কেউ ডিসিপ্লিন মেনে না চললে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই আমাকে কঠোর হতে হবে।

কিন্তু আমি যতদূর বুঝতে পারছি... আমি নতুন এসেছি... আমার রিডিং ভুল হতে পারে... আপনি যে ডিসিপ্লিনের কথা বলছেন, সেটা যদি ব্রেক হয়েই থাকে তাহলে তার জন্যে মুক্তি একা দায়ী নন... বায়েজিদেরও এতে হাত আছে...

মানুদা চোখ তুলে তাকালেন।

রহমান সাহেব বলে চললেন, তাহলে আপনি শুধু মুক্তির এগেইনস্টে কেন

এ্যাকশন নিচ্ছেন। বায়েজিদের বিরুদ্ধেও একশন নিতে হবে। আমার সাজেশনটা হলো... নাটকের দিকে তাকালে আপনার মুক্তিকে নিতে হবে আর বায়েজিদকে বাদ দিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, মোনাকে দিয়ে ওই ক্যারেক্টার হবে না। আর বায়েজিদের বদলে এ্যানিবডি উইল ডু। ইন দ্যাট কেইস, আপনি আমার কথাটা বিবেচনা করতে পারেন। বিশু ক্যারাক্টারটা আমি ভালো পারব।

মানুদার ভীষণ রাগ হচ্ছে। মনে হচ্ছে কষে এই বেটার গালে একটা চড় মারেন। কিন্তু তিনি রাগ দমন করলেন। দশ হাজার টাকা ফেলনা নয়।

রহমান সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, আমি কিন্তু কোনো প্রিকন্ডিশন দিচ্ছি না। আমি শুধু আপনাকে একটা অল্টারনেটিভ সাজেশন দিলাম... রাখা না রাখা আপনার ইচ্ছা...



পরের দিন আবার মহড়া। মোনা নন্দিনী করল। বিপ্লবদা অধ্যাপক। বিপ্লবদা বললেন, মানুদা, মোনাকে বলেন আগে পুরা ডায়লগ মুখস্থ করে আসতে।

মানুদা বললেন, মুখস্থ না হয় করল। তারপর গান, নাচ, কাজটা কঠিন। আপনারা অধৈর্য হবেন না। আস্তে-আস্তে হবে।

মুক্তি বলল, মানুদা, আমি আর কাল থেকে আসব না।

মানুদা কাজের ভাণ করে খাতার দিকে তাকিয়ে বললেন, আসবে না। কেন?

মুক্তি তখন যেন বোমাটা ফাটাল। বলল, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

সবাই একযোগে কথা বলে ওঠায় গুঞ্জন সৃষ্টি হলো।

মানুদা মুখ তুললেন। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কী বলছ তুমি?

জি হঠাৎ করে হলো। আমার খালাতো ভাইয়ের সাথে।

না-না। খালাতোভাইয়ের সাথে বিয়ে ঠিক না। আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হলে জেনিটিক্যাল প্রবলেম হয়।

বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এখন এসব বলবেন না মানুদা। বায়েজিদ ভাই, চলেন। আমাকে রিকশা ঠিক করে দেন। মুক্তি কাউকে কিছু না বলে উঠে পড়ল।

বায়েজিদ ছুটল তার পিছে পিছে। মুক্তি একটা রিকশা ডেকে তাতে উঠে পড়ল। দৌড়ে গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল বায়েজিদ।

বায়েজিদ বলল, মুক্তি তোর এই মিথ্যা কথা বলার গুণটা তো ডেঞ্জারাস। একদম চোখমুখ অবিকৃত রেখে বলে দিতে পারলি তোর বিয়ে... মানুদা খুব চোট পেয়েছে, যাক।

মুক্তি গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, তুই আমার সব কথাকে অভিনয় ভাবিস। আমি খুব কষ্ট পাই।

মানে? ধ্যেৎ তুই আবার অভিনয় করতেছিস। এবং খুব ভালো অভিনয়।

আমি না ধরতেই পারতেছি না তোর কোনটা অভিনয়, কোনটা রিয়েল...

তুই এটা কী বললি, আমি সব সময় অভিনয় করি। সত্যিকারের বিয়ে করে আমি দেখিয়ে দেব আমি সত্য কথা বলি। বুঝলি।

বায়েজিদ হেসে ফেলল, কাকে তুই বিয়ে করবি, কিছু ঠিক করছিস?

বললাম তো খালাতো ভাই। ছেলের নাম রয়েল। ঢাকায় থাকে। গাড়ি-বাড়ি আছে।

বায়েজিদ মুখের হাসি ধরে রেখে বলল, বাহবা। খুব ভালো পটাইছিস তো। এই আমরা ঢাকায় গেলে তোর বাসায় উঠতে দিবি তো?

কী জানি। লোকটা কেমন হবে, খুব ভালো তো ধারণা নাই।

তুই কি সত্যি বলতেছিস? আমার চোখ ছুঁইয়া বল তো।

চোখ ছুঁইয়া বলব কেন? বিশ্বাস করতে হলে করবি। না হলে করবি না। এই নাম। পাড়া আসি গেছে। আমার পাড়ায় তোকে পাশে নিয়া যাব না।

বায়েজিদ নেমে গেল। কিন্তু তার ধন্দ কাটে না। মুক্তি কি সত্য বলছে নাকি মিথ্যা? মিথ্যা বলার অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে মেয়েটা। কিন্তু গল্পের মিথ্যাবাদী রাখালের মতো আজ যদি সে সত্য কথা বলে থাকে!

মুক্তির বিয়ে, কথাটা শোনার পর থেকেই সবকিছু শূন্য লাগতে শুরু করল মানুদার। তার জীবনটা এমনিতেই শূন্য। ৪৬ বছরের জীবনে তিনি বিয়ে করেননি। তার গ্রামের বাড়ির কারও সঙ্গেই তার যোগাযোগ নেই। জেলা পরিষদ অফিসের তিনি কেরানি, কিন্তু নাটক-অন্ত প্রাণ। রক্তকরবী তার সারা জীবনের স্বপ্ন। এই প্রযোজনাটা তার ভালো হতেই হবে। মুক্তিকে পেয়ে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। এখন মুক্তিরই যদি বিয়ে হয়ে যায়, রক্তকরবী মাথায় উঠবে। মোনাকে দিয়ে নন্দিনী করাতে তো আসলে চান না। সেটা সম্ভবও না। শুধু মুক্তিকে একটু চাপে ফেলার জন্যে এই বুদ্ধিটা তিনি প্রয়োগ করেছিলেন। না। ব্যাপারটা তো বুমেরাং হয়ে গেল। মুক্তির বাসায় যাওয়া দরকার।

সাইকেল নিয়ে তিনি ছুটলেন কেরানিপাড়ায়, শ্যামাসুন্দরী খালের তীরবর্তী মুক্তির ভাইয়ের বাসায়।

বেল টিপলেন।

কে? মুক্তির গলা।

আমি মানুদা।

মুক্তি দরজা খুলল। মানুদা ভিতরে আসেন।

মানুদা ড্রয়িং রুমের বেতের সোফায় বসতে বসতে বললেন, শোনো। আমি তোমার অভিমান ভাঙাতে এসেছি।

মুক্তি বিষণ্ন ভঙ্গিতে ঘাড় এলিয়ে বলল, আমি তো অভিমান করি নাই।

মেইন ক্যারেক্টারটাই তুমি করবে। মোনাকে দিয়ে ওটা হবে না।

আরে না। সেজন্যে না। আমার বিয়ে যার সাথে তারা খুব কনজারভেটিভ ফ্যামিলি। তারা চায় না আমি নাটক করি।

এমন একটা কনজারভটিভ ফ্যামিলিতে বিয়ে করতে তুমি রাজি হচ্ছ কেন? তুমি শিল্পী মানুষ। যে ফ্যামিলি নাটক করতে দেয় না, সেই ঘরে কেন যাবে। যেখানে তোমার কদর হবে, সে ঘরে যাবে।

এখন আর এসব কথা বলে কী লাভ?

লাভ নাই বলছ?

শোনেন মানুদা। দুদিন আগেও যদি এই বিয়ের প্রস্তাবটা আমার কাছে আসত, আমি হয়তো রাজি হতাম না। কিন্তু এমন একটা সময়ে প্রস্তাবটা আসল আমার কাছে মনে হলো, যাক বাবা বাঁচলাম। মাঝে-মধ্যে এভাবে কিন্তু বাঁচি যাওয়া যায়।

মানুদা ফট করে মুক্তির হাতদুটো নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল, তুমি আমার ওপরে রাগ করে কোনো সিদ্ধান্ত নিও না। আমি তোমার সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করি সে তো তোমার বা আমার মধ্যেকার কোনো গণ্ডগোল থেকে নয়, নাটকের জন্যে থিয়েটারের জন্যে। ঠিক আছে? আমি আসি।

চা খেয়ে যান।

না আজকে আর চা খেতে ইচ্ছা করছে না।

চা খেয়ে যান। আপনি চা খেতে খেতে আমি ডিসিশন পাল্টাতেও পারি। বিয়ে করার জন্যে তো আমি পাগলা হয়ে যাই নাই।

মানুদার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। দাও। চা দাও।

কী চা খাবেন, লেবু চা, নাকি দুধ চা।

যেকোনো একটা হলেই হয়।

তাহলে দুই কাপ চা আনি। লেবু চাও। আবার দুধ চাও। আপনি দুই কাপ চা খান।

মুক্তি ভেতরে গেল চা বানাতে।

এই সময় মুক্তির ভাবি ঢুকলেন ঘরে। কেশে বললেন, মানুদা কেমন আছেন।

মানুদা বললেন, আছি ভালো। আপনি কেমন আছেন।

ভাবি বলল, আছি এক রকম। আপনাদের শিল্পী কি খালি নাটক করবে, নাকি বিয়ে-শাদিও করতে হবে। আম্মার বোনের একটা ছেলে ওকে বিয়ে করার জন্যে পাগল, সে কিছুতেই রাজি না। বলে রক্তকরবী না করে আমি বিয়ে করব, পাগল নাকি!

মুক্তি সত্য সত্য দু কাপ চা আনল। একটা র চা আরেকটা দুধ চা।

মানুদা বললেন, মুক্তি। শোনো পাগলামি করো না। আগে রক্তকরবীটা নামাই। তারপর তোমার বিয়ে-শাদি যা যা করা দরকার সব করো। আর শোনো, শিল্পকলা একাডেমীর ওয়ার্কশপটা পরশুদিন থেকে। তোমার নাম কিন্তু দিয়েছি। ঠিকমতো যাবে। ঢাকা থেকে গেস্ট লেকচারার আসছে। তারা দেখবে না রংপুরের পারফরমাররা কেমন। তুমি না গেলে তো আমাদের সবার দুর্নাম হবে। ভাবি এ কাপটা আপনি খান।

ভাবি বললেন, আমি তো চা খাই না। আমার গ্যাস্ট্রিক।

মুক্তি বলল, আমি এত শখ করে বানালাম আপনার জন্যে খান না। শোনেন আমার কোনো ঢাকার গেস্ট লেকচারার লাগবে না। আপনি যা শেখাচ্ছেন তাই যথেষ্ট। নেন চা খান। দুই কাপই খাইতে হবে কিন্তু।

মানুদা দুই কাপ চা-ই বাধ্য ছেলের মতো এক কাপ এক কাপ করে খেলেন। মুখে বললেন, আরে না। তাই হয় নাকি। শোনো ঢাকার ট্রেইনারদের কথা শোনো। ভালো কিছু শিক্ষা পেয়েও যেতে পারো।

ভাবি বললেন, বাইরের আর্টিস্ট কে আসতেছে?

মানুদা বললেন, শুনলাম তৌফিক আহমেদ আসতেছে।

মুক্তি বলল, ও। উনি কেমন?

মানুদা বললেন, তৌফিক আহমেদ তো থিয়েটার করা ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তো খালি টেলিভিশনের নাটকগুলোয় নায়ক হয়। লেকচার কেমন দেবে, আমার সন্দেহ আছে।

মুক্তি বলল, ও।

মানুদা বললেন, তবু আগে তো গ্রুপ থিয়েটার করত। আর্ট কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছে। স্টেজ প্রপস লাইট এসব খুব ভালো বোঝার কথা।

মুক্তি বলল, আমার অবশ্য ওনাকে দেখলে মাকাল ফল মাকাল ফল লাগে। খালি চেহারাটাই আছে। অভিনয় হয় না।

মানুদা বললেন, এভাবে বলো না। শিল্পীকে সম্মান না করলে তুমি নিজে

সম্মান পাবে না। উঠি।

মানুদা বেরিয়ে পড়লেন। মুক্তি তাকিয়ে দেখল গেছে কিনা। যেই মানুদা আড়াল হয়েছেন অমনি মুক্তি ভাবিকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে মেতে উঠল—ভাবি। ভাবি। তৌফিক আহমেদ আসতেছে আমাদের রংপুরে। তৌফিক আহমেদ। আমার ফেবারিট আর্টিস্ট। উহ *যেখানে সাগর নীল* নাটকে ওনার অভিনয় দেখে কত কান্নাকাটি করেছি।

এর মধ্যে মানুদা ফিরে এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়।

ভাবি মুক্তিকে চিমটি কাটলেন। মুখে বললেন, জি মানুদা। আপনি আবার!

মানুদা বললেন, আমার চশমাটা ফেলে গেছি।



তৌফিক আহমেদ দেশের প্রখ্যাত অভিনেতা। আগে গ্রুপ থিয়েটার করতেন। এখন নাটকের চাপে আর গ্রুপকে সময় দিতে পারেন না। কিন্তু রংপুরের নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরে ক্লাস নিতে তিনি রংপুর চলে আসছেন, এটা কল্পনাও করা যায় না। রংপুরের নাট্যামোদীদের মধ্যে তাই সাড়া পড়ে গেছে। সবাই এই শিবিরে অংশ নিতে চায়। স্বরবর্ণ থিয়েটারের ছেলে-মেয়েরাও চায়। কিন্তু মানুদার সামনে সেই কথা কেউ বলতে পারে না মুখ ফুটে। কারণ, মানুদা মনে করেন, তৌফিক আহমেদ কোনো আদর্শ নাট্যশিল্পী নন। যিনি গ্রুপ থিয়েটার বাদ দিয়ে টেলিভিশনে বেশি সময় দেন, তিনি তারকা হতে পারেন, অভিনেতা না। তার কাছে কিছু শেখার নাই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চারজনের নাম শিল্পকলা একাডেমীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে স্বরবর্ণ থিয়েটার থেকে। বায়েজিদ, শাহিন, মুক্তি আর মোনা।

তৌফিক আহমেদ আগমনী এসি বাসে রংপুর এসে নামলেন। তিনি কাউকে বলে আসেননি। রংপুর গিয়ে তিনি উঠবেন রেজা স্যারের বাসায়। রেজা স্যারের দোতলা বাড়ি। চারদিকে গাছ। সামনে পুকুর। পুরোনো আমলের হিন্দুবাড়ি। এই বাড়ি রেজা স্যার ভারত গমনেচ্ছু হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন।

শিল্পকলা একাডেমীর সংগঠক আবদুল আউয়াল এই বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছে তৌফিক আহমেদের জন্যে। তৌফিক আহমেদ অবশ্য সার্কিট হাউসে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সার্কিট হাউসে তিন মন্ত্রী এসে উঠেছেন। সারাক্ষণ ভিড়-ভাট্টা লেগে থাকে। তৌফিক সবচেয়ে ভয় পান ভিড়কে। রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ভিড় সবচেয়ে অপছন্দ। কোনো কারণে কারো সঙ্গে একটু ধাক্কা লাগলেই এরা জিনিসটাকে দলা পাকিয়ে ফেলে। তারপর বিক্ষোভমিছিল, মাফ চাওয়া নানা কিছু শুরু হয়ে যায়। কাজেই তৌফিক আহমেদ যখন রেজা স্যারের বাড়ির বর্ণনা শুনলেন, রাজি হয়ে গেলেন।

আগমনী বাসের যাত্রীরা সবাই তাকে চিনতে পারল। তারা অনেকেই এসে তার সঙ্গে আলাপ করল। রংপুরে কেন যাচ্ছেন, কোথায় উঠবেন, বাসযাত্রীরা জানতে চাইল।

তৌফিক আহমেদ বাস থেকে নেমে একটা রিকশা নিলেন। রিকশাওয়ালারা তার দিকে কৌতূহলভরে তাকাচ্ছে। তিনি রিকশায় উঠে বললেন, চলেন কামালকাছনা, রেজা স্যারের বাসা।

রিকশা চলতে শুরু করল। তৌফিক আহমেদ রিকশাওয়ালার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন, রেজা স্যারের বাসা চেনেন তো!

রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে মিষ্টি করে হাসল—চিনি না ফির।

ভাড়া কত নিবেন?

আপনে বাহে অংপুরের মেহমান। আপনাকে কি আর ঠকানো যাইবে? বাহে স্যার আপনে একলা আসলেন?

স্যার কি একা আসলেন।

হ্যাঁ।

স্যার নতুন সিনেমা কী করতেছেন?

করছি।

রেজা স্যারের বাসায় থাকবেন?

হ্যাঁ।

কয়দিন।

চার পাঁচদিন। আপনাদের এখানে বেগম রোকেয়ার বাড়ি কোথায়, চেনেন?

না বাহে চিনোম না।

কী বলেন। বেগম রোকেয়ার বাড়ি চেনেন না। জানেন উনি কত বড় মহিলা? ওনার নামে কত কলেজ?

আমাদের এটে বাহে রোকেয়া কলেজ আছে।

তাহলে রোকেয়ার বাড়ি চেনেন না কেন?

গরিব মানুষ বাহে। লেখাপড়া শিখি নাই। আপনে স্যার বিয়া করছেন?

না করি নি।

বিপাশা হায়াত শমী কায়সার দুইজনের সাথেই আপনাকে ভালো মানায়। আপনে কাক বেশি পছন্দ করেন?

তৌফিক আহমেদ হো হো করে হেসে উঠলেন।

রেজা স্যারের বাসার সামনে রিকশা দাঁড়াল।

রিকশাভাড়া ১০ টাকা দিয়ে নেমে গেলেন তৌফিক আহমেদ। বাইরের থেকে অসাধারণ মনে হচ্ছে বাসাটাকে। এত গাছপালা। গেটে মাধবীলতার শোভন ডালপালা। ফুল ফুটে আছে। তারপর চুন-সুরকির দোতলা বাড়ি। লাল আর সাদা রঙের দেয়াল। কড়ি-বর্গা দেয়া ছাদ। বাড়ির সামনে উঠোন জুড়ে গাছ আর গাছ।

তৌফিক দোরঘণ্টি বাজালেন। দরজা খুলল একটা ছোট্ট ছেলে। বয়স ৬ কি ৭।

তৌফিক জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি রেজা স্যারের বাসা?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, না।

এটা রেজা স্যারের বাসা না?

না, এটা পপআইয়ের বাসা।

তুমি কে?

আমি পপআই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি খাই স্পিনাশ। পালং শাক। দ্যাখো আমার মাস্‌ল। ছেলেটা হাত মুঠো করে কনুই ভাঁজ করে তার বাহুর পেশি ফোলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

সেই সময় এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন তৌফিকের উদ্ধারে। তিনিই রেজা স্যার।

আরে আরে তৌফিক সাহেব। আসেন আসেন। আগে জানলে তো আমি বাসস্ট্যান্ডে লোক পাঠাতাম। আপনি এই রকম হুট করে চলে এলেন।

আমরা নাটকের লোক তো। আমরা নাটকীয়তা পছন্দ করি। কিন্তু ধরেন বাসস্ট্যান্ডে একটা সিন হোক, সেসব আবার আমাদের ভালো লাগে না। মাঝে-মধ্যে তো একা একা চলতেও ভালো লাগে, তাই না?

রাইট। আসুন। আমার নাম রেজাউন নবী। এলাকার সবাই আমাকে রেজা স্যার বলে ডাকে।

ছোট ছেলেটা তৌফিক আহমেদকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জরিপ করছে। রেজা স্যার বললেন, ওর নাম দীপ্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরা রংপুরে বলি ভাতিজা। খুব দুষ্ট। আসেন আসেন। আপনাকে আপনার ঘর দেখিয়ে দেই।

দোতলার একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তৌফিককে। ঘরটা পছন্দই হলো। পুরনো আমলের খাটে ধবধবে সাদা চাদর। পাশেই বাথরুম। বাথরুমে পানি আছে। যাক, বদনা ভরে যে বাথরুমে যেতে হবে না, সেটা একটা বড় বাঁচোয়া।



তৌফিক আহমেদ! উনি তো আমার জান! সংক্ষেপে এই হলো তৌফিক সম্পর্কে মুক্তির মূল্যায়ন। আজ শিল্পকলা একাডেমীর কর্মশালায় তৌফিক আহমেদ ক্লাস নেবেন, এটা ভাবতেই মুক্তির সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। পেটের মধ্যে গুড় গুড় ডাক শোনা গেল। সে কী পরে যাবে আজ? শাড়ি নাকি স্যালোয়ার কামিজ। কী রঙের? টিপ দেবে কপালে? লিপস্টিক? কোন রঙের চুড়ি?

মুক্তি নিজেকে নিয়ে এইভাবে আর কখনও ভেবেছে কিনা সন্দেহ আছে। আমি এই রকম করছি কেন? একবার নিজেকে বলে সে। এত বড় তারকা! সারাদেশে তার কত ভক্ত। আমি ছোট শহরের সাধারণ মেয়ে। এসএসসি পাস। আইএ ভর্তি হয়েছি, কিন্তু ক্লাস করি না। আমার বাবা নাই, মা মারা গেছে জন্মের সময়। আমাকে কি আর তার চোখে পড়বে!

কিন্তু চোখে পড়ল। ভালোভাবেই পড়ল। তৌফিক আহমেদ উপস্থিত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেন। ও মাই গড। এই শহরে এত সুন্দর একটা মেয়ে কোত্থেকে এলো। তৌফিক প্রথম দেখাতেই ভিরমি খেলেন।

ঢাকা শহরে সুন্দরী মেয়েদের নিয়েই তার কাজকারবার। নাটকের মেয়েরা তো আছেই, কোনো বাড়িতে বেড়াতে গেলেও সুন্দরী মেয়েরা এগিয়ে আসে, অভিনয় বা মডেলিংয়ের সুযোগ করে দেয়ার অনুরোধ জানায়। আর আছে তার ভক্তরা। সারাক্ষণই মেয়েরা ফোন করে তার ফোনে, মোবাইলে। এ পর্যন্ত তিনবার মোবাইল সিম বদলাতে হয়েছে তাকে।

কিন্তু আজ এই রংপুরে তিনি যে মেয়েটিকে দেখলেন, তার চেয়ে সুন্দর মেয়ে তিনি আর দেখেছেন কিনা সন্দেহ।

ওয়ার্কশপ শুরুর সময়েই সবার নামধাম জানতে চাওয়া হয়। তখনই তৌফিক জেনে যান, মেয়েটার নাম মুক্তি। সে এসেছে স্বরবর্ণ থিয়েটার থেকে।

এরপর তৌফিক বললেন, প্রথমে একটা কথা বলে নেয়া দরকার, আমি থিয়েটার তেমন করিনি। থিয়েটারের পক্ষ থেকে এখানে উপস্থিত আছেন নাট্য

প্রশিক্ষক আহমেদ সেলিম। নাটকের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বলবেন রেজা স্যার। আমি বলব প্রাকটিক্যালি টেলিভিশনে সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে আমি যে সমস্ত এক্সপেরিয়েন্সের মুখোমুখি হয়েছি, সেসব গল্প। গল্প—আমারগুলো হবে গল্পই।

তার আগে গল্প কী করে মুখ থেকে মুখে ছড়ায় এ নিয়ে একটা খেলা হয়ে যাক।

মুক্তিকে দেখিয়ে তৌফিক বললেন, আমি এনার কানে একটা কথা বলব, উনি সেটা বলবেন পাশেরজনের কানে। এভাবে চলবে। এভাবে শেষ মাথায় যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার কানে পৌঁছাবে কথাটা। কথাটা কী, এটা এই কাগজে লেখা আছে। আমি সেটা দেখে ওনার কানে পড়ব। উনি সেটা পাশের জনের কানে বলবেন। ক্লিয়ার?

সবাই মাথা নাড়ল।

তৌফিক মুক্তির কানের কাছে মুখ আনল। কাগজ খুলে সে পড়বে। তার আগে সে বলে নিল, আপনি তো খুব সুন্দর। আপনার মধ্যে অনেক বড় শিল্পী হবার সম্ভাবনা আছে।

মুক্তি বলল, আমি আপনার একজন ভক্ত। আপনাকে আমি খুব পছন্দ করি।

তৌফিক বলল, ধন্যবাদ। এই কথাগুলো আবার ওর কানে বলে দেবেন না। আমি কাগজ দেখে পড়ছি। সেটা বলেন। বাঙালির প্রিয় হলো ভাতমাছ। বিহারিদের রুটি। আমি ভাতও খাই। রুটিও খাই। মাছ পাই না, তাই খাই না।

মুক্তি কথাটা বলল পাশের জনের কানে। পাশের জন আবার তার পাশের জনের কানে।

সবার শেষ কানে কথা পৌঁছে গেছে।

এবার আপনি বলেন, আপনাকে কী বলা হয়েছে। তৌফিক বললেন।

মাছ বাঙালির প্রিয়। রুটিও প্রিয়। বিহারিরা মাছ পায় না তাই খায় না। শেষের জন বলল।

তৌফিক হাসতে হাসতে বললেন, মুক্তি। আপনি পড়ে শোনান। অরিজিনালি আমার কাগজে কী লেখা ছিল...

রেজা স্যার ছিলেন এতক্ষণ। তিনি চলে যাবেন। সেলিম সাহেব আর তৌফিক ওয়ার্কশপ এগিয়ে নেবেন। যাওয়ার আগে রেজা স্যার ডাকলেন মুক্তিকে। একটু আড়ালে। মুক্তি শোনো। তুমি তো রক্তকরবীর নন্দিনী হচ্ছ। তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই পড়ো তো, না?

মুক্তি বলল, জি স্যার। তবে বই তো স্যার তেমন পাওয়া যায় না।

শোনো আমার বাসায় পুরো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছে। তুমি এসো। তোমাকে পড়তে দেব।

মুক্তি খুশি। আচ্ছা স্যার। আসব।

মুক্তি জানে, তৌফিক আহমেদ উঠেছেন রেজা স্যারের বাসায়। বইয়ের খোঁজে গিয়ে তৌফিক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা যাবে।

কর্মশালা হয় রোজ বিকাল দুটো থেকে। সকালে কোনো কাজ নাই। মুক্তি বলে রেখেছে বায়েজিদকে, কালকে সকালে আসবি। বায়েজিদ এলো তাই সকাল সকাল। রিকশা চলছে কেরানিপাড়ার দিকে, মুক্তির বাড়ির দিকে, বায়েজিদের হঠাৎ মনে হয়, সে কেন যাচ্ছে মুক্তির বাড়িতে? মুক্তি তার কে? তার সঙ্গে মুক্তির কী সম্পর্ক? মুক্তি যদি হয় নন্দিনী, তাহলে বায়েজিদ কে? সে কি কিশোর! শুধু রোজ একগুচ্ছ রক্তকরবী নন্দিনীকে পেড়ে এনে দেয়াতেই তার আনন্দ। নাকি সে বিশু পাগলা। নন্দিনীর পাগল ভাই! যার কাছে গান শোনে নন্দিনী, আর যার জন্যে অপেক্ষা করে রঞ্জনের মৃত্যুর পরেও। বিশুর চরিত্রেই অভিনয় করছে বায়েজিদ, তাদের গ্রুপ থিয়েটারের রক্তকরবী প্রযোজনায়, কিন্তু সে কি বিশু হতে চায়, নাকি রঞ্জন। নন্দিনী যার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, সারাটা ক্ষণ।

মুক্তির বাড়ি গিয়ে বায়েজিদ দেখতে পেল, মুক্তি তৈরি হয়েই ছিল। দোরঘণ্টি বাজা মাত্র বেরিয়ে এলো। মুক্তি শাড়ি পরেছে। দেশী তাঁতের শাড়ি। হালকা ঘিয়ে রঙের পটে কমলা রঙের দেশী মোটিফ। গলায় মাটির গয়না। কমলা রঙের বড় টিপ। কী সুন্দরই না দেখা যাচ্ছে মুক্তিকে।

তারা রিকশায় উঠে পড়ল।

রিকশা চলছে।

বায়েজিদ বলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

রেজা স্যারের বাসায়। মুক্তি জবাব দিল।

কেন?

রবীন্দ্রনাথের বই আনতে।

তুই কবে থেকে রবীন্দ্রনাথ পড়তে শুরু করলি?

খবরদার রেজা স্যারের সামনে এইসব বলবি না। আমি খুব রবীন্দ্রনাথ পড়ি। তুই কী জানিস?

না আমি কিচ্ছু জানি না।

রেজা স্যারের বাড়ি গিয়ে বেল টিপল তারা। দরজা খুলল একটা ছোট্ট ছেলে।

মুক্তি বলল, আপনি কে?

ছেলেটা বলল, আমার নাম পপআই। তুমি কে?

মুক্তি বলল, আমার নাম ওলিভ।

ছেলেটা বলল, ও তাহলে তো তুমি আমার বউ। আসো আমার সাথে। ছেলেটা মুক্তিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল নিচতলার বৈঠকখানায়।

বায়েজিদ হাসে। বলে, রেজা স্যারের ভাস্তে। ওর নাম দীপ্র।

দীপ্র প্রতিবাদ জানায়, আমার নাম দীপ্র না। আমার নাম পপআই। আর ও ওলিভ। আমার বউ।

রেজা স্যার চলে আসেন। তিনি লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা। মুক্তিকে দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি ভেতরে গেলেন। একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে এলেন শরীরে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পাঞ্জাবিটা পরলেন উল্টো করে।

বললেন, আসো আসো মুক্তি। কী সৌভাগ্য আমার।

মুক্তি বলল, স্যার, আপনার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের বই নিব তাই চলি আসলাম।

রেজা স্যার বললেন, খুব ভালো করেছ। শোনো পড়াশোনাটাই হলো আসল। তুমি যা করতে চাও, তোমাকে আগে পড়তে হবে। নাচো, গান করো। সবকিছুর জন্যে তোমাকে পড়তে হবে।

স্যার উনি বায়েজিদ। আপনি তো চেনেনই।

হ্যাঁ। খুব ভালো চিনি। বায়েজিদই তো আমাকে তোমাদের গ্রুপে আনা-নেয়া করে। কেমন আছ ভাই?

জি স্যার ভালো।

ওপরে তৌফিক সাহেব আছেন। তুমি যাও। গল্প করো। আমি মুক্তিকে রবীন্দ্রনাথের *ডাকঘর* নাটকটা একটু বুঝিয়ে দেই।

মুক্তি বলল, বায়েজিদ ভাই যাও। আমিও আসতেছি। স্যার, আমার বোঝা হয়ে গেলে স্যার ওকে বোঝাবেন। বায়েজিদ ভাইয়ের খুব বইপড়ার নেশা।

বায়েজিদ কিল দেখিয়ে চলে গেল ওপরে।

মুক্তি দেয়াল জুড়ে থরে থরে সাজানো বই দেখে বলল, স্যার আপনার এত বই। এত বই তো স্যার আমি এক জীবনেও শেষ করতে পারব না।

রেজা স্যার বললেন, এই কথাটা বড় মানুষেরা বলে গেছে তো। দুনিয়াতে এত বই, তার কটাই বা আমরা পড়তে পারি।

মুক্তি পায়ের বুড়ো আঙুলে মেঝে খুঁটতে খুঁটতে বলল, আমার স্যর পড়তে খুব ইচ্ছা করে। সময় পাই না। বইও পাওয়া যায় না।

সময় করে নিতে হয়। আর বই তো তুমি আমার কাছে থেকেই নিতে পারো।

আপনি স্যার বই ধার দেন? আলমারির কাচে বড় বড় করে লেখা: বই ধার দেয়া হয় না, সেদিকে চোখ পড়তেই মুক্তি বলল।

দেই না। কিন্তু তোমাকে দেব। প্রিয় মানুষদের তো না করা যায় না। যায়, বলো?

স্যার তৌফিক ভাই আমার জন্যে বসি আছেন। ওনার সাথে এ্যাপয়েনমেন্ট করে আসছি...আধঘণ্টা লেট হয়ে গেছে...

আরে তৌফিক তো থাকছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে না। বই বাছো।

তাহলে স্যার আমি ওনাকে বলি আসি। যাব আর আসব।

আচ্ছা। যাবে আর আসবে...

বায়েজিদ ওপরে তৌফিক আহমেদের কাছে গেলে তাকে দেখে তৌফিক খানিকটা বিরক্ত হয়েছিলেন। রাতে ভালো ঘুম হয় নাই, ভেবেছিলেন ১০টা থেকে ১১টা একটু গড়িয়ে নেবেন। এই সময় কোত্থেকে এই উটকো ঝামেলা হাজির। তাকে চলে যেতে বলবেন কিনা ভাবছেন, এই সময় বায়েজিদ বলল, তৌফিক ভাই, মুক্তি আসছে, নিচে স্যারের কাছে আটকা পড়ছে। আসতেছে।

শুনে তৌফিক উঠে একটা ভালো ফতুয়া পরে নিল।

মুক্তি মেয়েটা তাকে আকর্ষণ করছে। মেয়েটি সুন্দরী। সপ্রতিভও। কথা বলে দারুণ। কোনো কিছু বোঝালে বুঝতে পারে, রসিকতা শুনে হাসে, আর যে অনুশীলন করতে দেয়া হয়, চমৎকারভাবে করে।

কর্মশালা কেমন লাগছে, বায়েজিদের সঙ্গে এই জাতীয় আলাপ করতে করতে তৌফিক কান পেতে রাখলেন সিঁড়িতে, কখন উঠবে মুক্তি। মুক্তির অবশ্য মুক্তি পেতে খানিকটা সময় লাগলই। সে উপরে উঠে এলে তৌফিক বলল, কী ব্যাপার, রেজা স্যারের সঙ্গে এত কি গল্প?

মুক্তি হেসে বলল, বোঝেন না। মুরব্বি মানুষ। কথা বলার লোক পায় না। পাইলে আর ছাড়তে চায় না।

মুক্তির হাসিটা সুন্দর। তৌফিক মুগ্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

এটা ওটা কথার পর তৌফিক বললেন, মুক্তি, আমরা রক্তকরবী নিয়ে কথা

বলতে পারি। স্ক্রিপ্টটা সাথে আছে?

মুক্তি জানাল, নাই।

বায়েজিদ বলল, রেজা স্যারের কাছে আছে।

মুক্তি বলল, আমি নিয়ে আসি।

তৌফিক বলল, আপনি যাবেন। আপনি গেলে তো রেজা স্যার আর আপনাকে ছাড়বে না। না। আপনি থাকুন। বায়েজিদ ভাই। এ উপকারটা একটু করবেন। রক্তকরবী বইটা একটু আনবেন?

বায়েজিদ বলল, নিশ্চয়।

সিঁড়িতে নামতে নামতে বিরক্ত বায়েজিদ বলল, ধেত্তেরি।

রেজা স্যারের পড়ার ঘর। তিনি উল্টো মুখ হয়ে বই দেখছেন। বায়েজিদ গেল সেখানে।

রেজা স্যার বললেন, আরে বায়েজিদ তুমি। মুক্তি কই?

ওরা স্যার রক্তকরবী নিয়ে আলোচনা করতেছে।

রেজা স্যার হেসে বললেন, তৌফিক রক্তকরবী নিয়ে আলাপ করছে? তৌফিক?

বায়েজিদ বলল, স্যার রক্তকরবী বইটা কি আপনার কাছে আছে। দিবেন?

মুক্তিকে আসতে বলো। রক্তকরবীর আগে তো বসন্ত, নাকি? আগে বসন্ত নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

বায়েজিদ বলল, ঠিক আছে পাঠায়ে দিচ্ছি।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে রাস্তায় চলে গেল। এভাবে কাবাব মে হাড্ডি হয়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

বায়েজিদ রাস্তায় গেল। কিন্তু তার ভালো লাগছে না। সে একটা দোকানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটটা তার বিস্বাদ লাগছে। সে সিগারেট ফেলে দিয়ে এক কাপ চা নিল। খাচ্ছে, কিন্তু চাটা মনে হচ্ছে তিতকুটে। একটা পান নিল সে। জর্দা সমেত। খেলো।

তারপর এদিক-ওদিক আপন মনে হাঁটল।

কিন্তু তার মন পড়ে রইল রেজা স্যারের ঘরে দোতলায়। তৌফিক ভাইয়ের কাছে মুক্তিকে রেখে এসেছে। কাজটা ঠিক হয়নি।

আবার সে ফিরে এলো রেজা স্যারের বাসায়। ওপরে গেল। দেখতে পেল, তৌফিক আর মুক্তি গল্পে বিভোর।

বায়েজিদ ঘরে ঢুকে পড়ল।

ফেরার সময় প্রথমে ধরলেন রেজা স্যার। কই মুক্তি বই নিলে না?

হ্যাঁ। তাই তো বই নিতে হবে। বই নিলে সেটা ফেরত দিতে আবার আসা যাবে রেজা স্যারের বাসায়।

মুক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘরটা নিল। রেজা স্যার চেয়েছিলেন বইটা নিয়ে মুক্তির সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করতে। কিন্তু মুক্তির সময় কই। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

বায়েজিদের সঙ্গে রিকশার সন্ধানে হাঁটছে মুক্তি।

মুক্তি যেন হাঁটছে না, উড়ছে। বলল, তৌফিক ভাই খুব সুন্দর করে কথা বলেন, না? শুধু শুনতে ইচ্ছা করে। গলার স্বরটা দেখছিস?

বায়েজিদ বলল, আমার কাছে অবশ্য ওনার কথা তেমন কিছু অসাধারণ মনে হলো না। তৌফিক ভাই সম্পর্কে তোমার আগ্রহটা একটু বেশি মনে হচ্ছে।

তা একটু বেশি। এর কারণ আছে। তৌফিক ভাই রংপুরে একটা প্যাকেজ নাটক নিয়ে আসবে। উনি হিরো। হিরোইন নিবে রংপুর থেকে...

বায়েজিদ বলল, মানুদা শুনলে তোকে দিবে নে? প্যাকেজ, হিরোইন... আমরা সবাই অ্যাক্টর...হিরোইন হিরো এসব কী?

মুক্তি বলল, তৌফিক ভাই বলছেন এই ওয়ার্কশপ থেকে আসলে উনি ওনার প্যাকেজের পারফরমার সিলেক্ট করবে। বায়েজিদ ভাই, তুই সিরিয়াসলি ওয়ার্কশপটা কর। তৌফিক ভাইয়ের প্যাকেজে তোকেও নিবে নিশ্চয়ই।

বায়েজিদ বলল, আমার সাথে তোর এত খাতির দেখলে আর আমাকে নিবে না।

যাহ। কী বলিস। তৌফিক ভাই এই রকম নাকি! কত ভালো একটা লোক!

আমি কি বলতেছি নাকি খারাপ। ভালো বলেই তো তোকে পছন্দ করছে, না! এখন তোকে নায়িকা বানায়া নিজে নায়ক হইয়া নাটক বানাবে।

নাটকের ওয়ার্কশপ চলছে। সেখানে মুক্তির সঙ্গে তৌফিকের দেখা তো হয়ই। এর পরেও দেখা হয়। তৌফিক রংপুর শহরের দর্শনীয় স্থান দেখতে চান। মুক্তি তার সঙ্গে যায়। আর সাথে থাকে হেলাল। হেলালদের মাইক্রোবাস আছে। মুক্তি তাকে অনুরোধ করল মাইক্রোবাসটা ধার দিতে। মুক্তির অনুরোধ। হেলাল ফেলতে পারল না। এরা দিনের বেলা একসঙ্গে তাজহাট রাজবাড়ি দেখতে যায়। বেগম রোকেয়ার বাড়ি পায়রাবন্দও গেল একদিন।

ওয়ার্কশপের শেষে রাত হয়ে গেছে। মুক্তি যথারীতি বাইরে বায়েজিদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বায়েজিদ আসে না। মুক্তিই এগিয়ে গেল বায়েজিদের

কাছে। বায়েজিদ ভাই। আমাকে একটু পৌঁছে দিয়ে আয় না।

বায়েজিদ বলল, তৌফিক ভাই বের হলে তার সাথে যা।

ও বাবা। বাবু মনে হচ্ছে মাইন্ড করছে। চল।

আমার কাজ আছে মুক্তি। তুই যা। বায়েজিদ অন্য দিকে চলে গেল। মুক্তির ভারি মন খারাপ হলো। বায়েজিদ তার সঙ্গে এই রকম আচরণ করতে পারল।

শিল্পী সংসদের ক্লাবঘরে ছেলেমেয়েরা সব বসে আছে। তারা তৌফিক আহমেদের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাতে চায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৌফিক গেলেন সেখানে।

সেখানেই তৌফিকের পরিচয় ঘটল মানুদার সঙ্গে।

তৌফিক বললেন, আপনি মানুদা। আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। সবাই তো শুধু দেখি মানুদা মানুদা করে। বিশেষ করে মেয়েরা। দাদা, আপনার ম্যাজিকটা কী?

মানুদা বললেন, বিলা করেন কেন রে ভাই। আমার তো আফসোস হচ্ছে আমি নিজেই কেন আপনার ছাত্র হলাম না?

তৌফিক বললেন, ছাত্র বলছেন কেন? ছিছিছি দেন ভাই একটু পদধূলি দেন ...সত্যি তৌফিক মানুদার পায়ে হাত দিল। তাতে মানুদার রাগটা একটু কমল। না ছেলে খারাপ না। আদব-লেহাজ আছে।



মুক্তি রেজা স্যারের বাসায়। রেজা স্যারের সামনে। ডাকঘর বইটা ফেরত দিল সে স্যারকে। বলল, স্যার, আজকে আরেকটা বই দেন। বই অজুহাত মাত্র। আসলে মুক্তির মন পড়ে আছে দোতলায়। তৌফিক আহমেদের কাছে।

রেজা স্যার বললেন, ডাকঘর পড়েছ?

জি স্যার। আসলে মুক্তি পড়ে নি। সারা সকাল সে কাটায় তৌফিক আহমেদের সঙ্গে। সারা বিকাল থাকে কর্মশালা। রাতের বেলা ক্লান্ত হয়ে ফেরে। ভাবিকে সাহায্য করে তার কাজে। সে বই পড়বে কখন? কিন্তু রেজা স্যারকে সে হতাশ করতে চায় না। আজকে রিকশায় উঠে সে ডাকঘর নাটকটা মেলে ধরেছে। রাস্তায় ২০ মিনিটে যতটুকুন পড়া যায়। তাতে অমলের জন্যে মুক্তির মনে এক ধরনের বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে। বইটা আরেকবার নিতে হবে স্যারের কাছ থেকে। পুরোটা পড়তে হবে।

রেজা স্যার আজকে আছেন ঘোরের মধ্যে! কিসের ঘোর? স্যারই বললেন, শোনো, রাণু ও ভানু পড়ছি বুঝলে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দারুণ লিখেছেন। পড়ে তো আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। রবীন্দ্রনাথ কেন রক্তকরবী লিখেছিলেন জানো? রাজা হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর নন্দিনী কে জানো? নন্দিনী হলো রাণু। একটা ছোট্ট কিশোরী মেয়ে। কী আশ্চর্য ব্যাপার। ৫৮ বছরের বুড়ো রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মন সব কেড়ে নিয়েছে একটা ১২/১৪ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে। তার নাম রাণু। সে যে শুধু রবি ঠাকুরের মাথা খেয়েছে, তা নয়, সে শান্তিনিকেতনে গিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। এলমহার্স্ট নামে এক ইংরেজ যুবক। সে হলো রঞ্জন। আর অধ্যাপক, মোড়ল, সর্দার, গোঁসাই সবই আছে ওই শান্তিনিকেতনেই। সুনীল একেবারে স্পষ্ট করে লিখেছেন। ভদ্রলোক লেখেন ভালো। রবীন্দ্রনাথ আর রাণুর এই অসম বয়সের প্রেমটার কথা তিনি সবই লিখেছেন, কিন্তু কোথাও কোনো মলিনতা নাই। কোথাও মনে হচ্ছে না যে প্রেমটা খারাপ, অনৈতিক, কোথাও পরিমিতি লঙ্ঘন নাই, আবার অন্য সব প্রেমের গল্পের মতো এখানেও মনে হচ্ছে রাণুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেন ছাড়াছাড়ি না হয়ে যায়, যেন রাণুর অন্য কোথাও বিয়ে

না হয়। সুনীল সাংঘাতিক বড় লেখক। তুমি মুক্তি নন্দিনী হয়েছ, তোমার অবশ্যই রাণু আর ভানু পড়তে হবে। অবশ্যই। পড়ে তুমি আমার কাছে আসবে। আমি তোমার সঙ্গেই ব্যাপারটা আলোচনা করতে চাই। আর কেউ তো এসব বুঝবে না।

আপনার পড়া হয়ে গেলে স্যার বইটা আমাকে দিয়েন।

আচ্ছা। আগে আমার পড়া শেষ হোক। আর দুটো পৃষ্ঠা বাকি আছে। বেশি না। তুমি এক কাজ কোরো, কালকে নাও।

ঠিক আছে স্যার। আমি আসি একটু ওপর থেকে।

মুক্তি দোতলায় চলে গেল। তৌফিক আহমেদ তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

মুক্তি বলল, চলেন। আজকে আরেকটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাব। কুকরুল বিল।

সেটা আবার কেমন জায়গা?

বিল একটা। নিরিবিলি খুব।

আচ্ছা আমি রেডি হয়ে আসছি। তৌফিক বাথরুমে ঢুকলেন।

মেয়েটা একা একা ওপরে গেল। তৌফিক সাহেব ঢাকার ছেলে। তার মূল্যবোধ আর রংপুর শহরের মূল্যবোধ এক নয়। আবার এমন কিছু করে না বসে, যাতে মুক্তি মেয়েটা আঘাত পায়। রেজা স্যার দীপ্রকে ডাকলেন। বললেন, যাও তো একটু দোতলায় যাও। গিয়ে দেখো, তোমার তৌফিক আংকেল কী করছেন?

দীপ্র দোতলায় উঠে এলো।

দেখল, মুক্তি একা বসে আছে।

দীপ্র মুক্তিকে বলল, তুমি না ওলিভ?

মুক্তি হাসল, হ্যাঁ।

আর আমি হলাম পপআই। তুমি আমার বউ। আর শোনো, ব্লুটো কই।

মানে?

ওই যে ওলিভকে যে সারাক্ষণ ধরে নিয়ে যায়। মনে হচ্ছে সে বাথরুমে।

ঠিক বলেছ।

বড়আব্বা আমাকে পাঠিয়েছেন তুমি কী করো তা জানতে। আমি গিয়ে কী বলব। তুমি বাথরুমে?

না। গিয়ে বলো ওরা বাইরে বেরিয়ে গেছে। একবারে সন্ধ্যার পরে ফিরবে।



বায়েজিদ সকাল সকাল হাজির মানুদার বাসায়।

কী ব্যাপার বায়েজিদ? হঠাৎ? মানুদা একটা স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে উঠোনের গাছের চারার যত্ন নিচ্ছিলেন। বায়েজিদকে দেখে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন।

আসলাম মানুদা। এমনি। এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম।

ভালো করেছ। বসো। দুই কাপ চা বানাই। বানিয়ে খাই।

চা লাগবে না মানুদা। মানুদা, আপনাকে কিন্তু কঠোর হতে হবে মানুদা। আপনি আমাদের গ্রুপের সব। আপনি আমাদের বাবা-মার মতো। আপনি ঢিল দিলে কিন্তু মুশকিল।

কী হয়েছে, হঠাৎ এসব বলছ?

না মানুদা। মুক্তি যা করতেছে, তাতে তো গ্রুপের দুর্নাম হচ্ছে। অন্য গ্রুপের ছেলেরা টিটকারি মারে। বিকন থিয়েটার, শিখা সংসদ, অভিযাত্রিক—সবাই হাসাহাসি করতেছে।

আরে কী হয়েছে বলবা তো।

মুক্তির কথা বলতেছি। ও তো সারা দিন ওই নায়কটার সাথে আঠার মতো লেগে আছে। সারা দিন একসাথে ঘোরে। প্রথম প্রথম যেত মাইক্রো নিয়া। এখন এক রিকশায় ঘুরতেছে।

তাতে কী হয়েছে? ও তো তোমার সাথেও এক রিকশায় ঘোরে। কি, ঘোরে না?

হ্যাঁ। ঘোরে। আমি এই শহরের ছেলে। আমার একটা স্টেশন আছে। আরে এসব সিনেমা থিয়েটারের লোক, এগলার চরিত্র কি আপনি বোঝেন না। মধু খেয়ে ভ্রমর কেটে পড়বে।

ছি বায়েজিদ! তুমি নিজে থিয়েটার করো। আরেকজন অভিনেতা সম্পর্কে তোমার মনোভাব যদি এই রকম হয়, কেমন করে হবে।

আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি মানুদা, আমি কিন্তু তৌফিকরে ধাওয়া দিব। একদম যেখানে যাবে দুইজনে, পোলাপান লাগায়া দিয়া বিয়া দিয়া দিব দুইজনের।

তাতে কি তুমি সুখী হবে? তুমি কি চাও তৌফিক ওকে বিয়ে করুক?

আরে করবে না তো। তাইলে এইসব ঢং-ঢাঙের মানে কী?

ঢাকা থেকে এসেছেন। দুদিনের অতিথি। দুদিন পরে চলে যাবেন। তুমি একদম অস্থির হয়ো না। আমি দেখছি ব্যাপারটা। আমি দেখছি।

দেখেন। আমি আসি মানুদা। আমার মন মেজাজ ভালো না বুঝতেই পারতেছেন।

বায়েজিদ চলে গেল।

মানুদার মনটাও খারাপ হয়ে যায়। মুক্তি মেয়েটার সঙ্গে কারো সম্পর্ক হোক, কী বিচিত্র কারণে সেটা তিনি সহ্য করতে পারেন না! অথচ তিনি যে মুক্তির প্রণয়-প্রার্থী, তাও না। মানুষের মন সত্যি বিচিত্র।

সন্ধ্যার পর মানুদা তার বিখ্যাত সাইকেলটা চালিয়ে হাজির হলেন মুক্তিদের বাসায়। একটু রাত করেই গেলেন। যাতে মুক্তিকে বাড়িতে পাওয়া যায়।

মুক্তিকে পাওয়া গেল।

মানুদা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন হচ্ছে মুক্তি তোমাদের ওয়ার্কশপ?

মুক্তি হাই তুলে বলল, একদম ভালো না। তৌফিক ভাই তো খালি দেখতেই ভালো। মাথায় কিছু নাই।

তাহলে তুমি তার সাথে ঘনঘন দেখা করছ। তার রুমে যাচ্ছ। তার সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ব্যাপার কী?

আরে না। রেজা স্যারের কাছে যাই। ডাকঘর পড়লাম। কালকে রাণু আর ভানু পড়ব। আপনি পড়ছেন মানুদা রাণু ও ভানু। পড়েন নাই? বলেন কি? রেজা স্যার তো বলল, রক্তকরবীর আসল ঘটনা নাকি রাণু ও ভানু।

তাই নাকি। পড়তে হবে তো তাহলে বইটা।

কালকে রেজা স্যার বইটা আমাকে দিবে। আমার পড়া হলে আপনাকে দিব।

মানুদা শক্ত গলায় বললেন, মুক্তি তোমাকে একটা কথা বলি। দেখো রংপুরের নাম ডুবিও না। এসব ঢাকার লোকেরা কিন্তু ডেঞ্জারাস হয়। যেখানেই যায় প্রেমের অভিনয় করে...

এসব কথা আপনি আমাকে বলতেছেন কেন?

তোমার চোখে আমি মুগ্ধতা দেখতে পাচ্ছি। এটার পরিণতি ভালো হবে না।

শোনেন আমি এই দুনিয়ায় শুধু একজনের দ্বারা মুগ্ধ। তার নাম বিকাশ চক্রবর্তী ওরফে মানু। এই জীবনে আমি আর অন্য কারও দ্বারা মুগ্ধ হবও না। মুক্তি মানুদার হাত ধরে ঝুলে পড়ল। আপনি যে আমাকে কী ভাবেন মানুদা, ছি...



সকালবেলা যথারীতি মুক্তি হাজির হলো রেজা স্যারের বাসায়। স্যার, আজকে আমাকে রাণু ও ভানু দিতে চাইছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি চলে আসলাম।

রেজা স্যার বললেন, আসো, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। বইটা পড়ে বুঝলে আমার মনটা যেন কেমন হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের জন্যে, রাণুর জন্যে এত খারাপ লাগছে। তোমাকে বোঝাতে পারব না। রাণুর বিয়ে হয়ে গেছে। বরকে নিয়ে সে বেড়াতে এসেছে শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ চাইছেন, রাতেরবেলা, যখন আর কেউ কাছে থাকবে না, তখন রাণু আসুক তার কাছে। একাকী। প্রকাশও করলেন তার এই চাওয়া। রাণুর কাছে। রাণু রাতে তাই ছুটে এলো। কিন্তু বিবাহিত মেয়ে। একা কি আর আসতে পারে। বরকে সঙ্গে নিয়ে এলো। রবীন্দ্রনাথ মনের কথা খুলে বলতে পারলেন না। পরের দিন রাণুরা চলে যাচ্ছে শান্তিনিকেতন থেকে। রাণু ভোরে গেল রবিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। সারারাত দুজনে কেউ ঘুমায় নাই। রাণু বলতে চেষ্টা করল, ভানুদা, কালরাতে... তাকে থামিয়ে দিলেন কবি।

রাণু আবার ব্যাকুলভাবে বললেন, ভানুদাদা, তোমাকে শুনতেই হবে—

কবি তাকে থামিয়ে দিলেন। ভাঙা গলায় বললেন, রাণু তুমি আর আমাকে ভানুদাদা বলে ডেকো না।

রেজা স্যার আবেগে মুক্তির দু হাত নিজের হাতে টেনে নিয়েছেন।

তার দুইচোখে জল। উষ্ণ সেই জলবিন্দু গড়িয়ে পড়ল মুক্তির হাতে। মুক্তি রেজা স্যারের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দীপ্র এসে ঢুকল ঘরে। রেজা স্যার সংবিৎ ফিরে পেলেন।

তৌফিক নেমে এলো নিচে। বলল, মুক্তি তুমি এসে গেছ। আজকে না আমাদের কান্তজির মন্দির দেখতে যাবার কথা। তুমি না বললে দূরের পথ। তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।

মুক্তি বলল, চলেন। বের হই।

দীপ্র বলল, ব্লুটো, তুমি আমার ওলিভকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও

বদমাস, আগে আমি স্পিনাশ খেয়ে নেই। তারপর তোমাকে...সে একটা টেডি বিয়ার নিয়ে এসে তা দিয়ে মার দিতে লাগল তৌফিককে।

তৌফিক আহমেদ চলে গেছে। যাওয়ার আগে প্রথম চুম্বনের স্বাদ দিয়ে গেছে মুক্তির ঠোঁটে। তারপর তাকে বলেছে, আমি আবার আসব। একটা প্যাকেজ নাটকের দল নিয়ে আসব। তুমি হবে সেটার নায়িকা। আমার জন্যে শিডিউল রেখে দিও কিন্তু।

মুক্তি তার জন্যে শিডিউল তুলে রেখেছে। তার সমস্ত জীবনের শিডিউল।

কিন্তু ঢাকায় ফিরে তৌফিক আর যোগাযোগ করে না। মুক্তির নিজের মোবাইল নাই। বাসায় ফোনও নাই। কাজেই সে তৌফিককে দোষ দেয় না। রাতের বেলা জেগে জেগে সে চিঠি লেখে তৌফিককে। সেই চিঠি তৌফিক পায় কিনা, সে জানে না। তার খালি কান্না পায়।

তার কিছুই ভালো লাগে না। সে স্বরবর্ণ থিয়েটারে যায়, কিন্তু রিহার্সালে তার মন নাই। সে সংলাপ ভুলে যায়। সে গান গায়, তাতে সুর ফোটে না। তাল কেটে যায়। সে নাচের জন্যে পা ফেলে, তার পদক্ষেপ মেলে না।

এই সময় মোনা একদিন হঠাৎ মুক্তির ব্যাগে রাণু ও ভানু বইটা দেখে বের করলে দেখতে পায়, ভেতরে একটা চিঠি। চিঠিটা দ্রুত পড়ে নেয় মোনা। বোঝাই যাচ্ছে তৌফিক আহমেদকে লেখা। সে চিঠিটা চুরি করে এবং পরে তা অর্পণ করে বায়েজিদকে।

বায়েজিদ রাতের বেলা হাজির হয় মুক্তির বাসায়। মুক্তি এটা কী?

আমার চিঠি তোর কাছে কেন? ছি-ছি-ছি বায়েজিদ। আমি তোর কাছে এত ছোটলোকপনা আশা করি নাই।

আর তুমি বড়লোক। না? তৌফিক আহমেদরে চিঠি লিখো।

হ্যাঁ। লিখেছি। তোর কী? আমি তাকে ভালোবাসি। তাকে চিঠি লিখি। তোর কী?

তাই তো। বায়েজিদের কী? বায়েজিদ ঠিক বোঝাতে পারে না। তার কী?

বায়েজিদ বিচার দেয় মানুদাকে। মানুদা সব শুনে বলে, আমার তো এখানে কিছু করার নাই। পারসোনাল ব্যাপার। কিন্তু আমি চাই ও নাটকটা ঠিকমতো করুক। তা তো সে করছে না। রিহার্সালে ঠিকভাবে আসে না। ডায়লগ ভুল করে। না। ওকে দিয়ে হবে না। আমাদেরকে একটা নতুন নন্দিনী খুঁজে বের করতে হবে। বুঝলে বায়েজিদ। আমাদের একজন নতুন নন্দিনী চাই।



মোনাকে দিয়ে নন্দিনীর প্রক্সি দেয়া চলছে। যদিও সবাই জানে, এটা ওকে দিয়ে হবে না। আরেকটা নতুন মেয়ে পাওয়া গেছে, এডিসি জেনারেল এসেছেন নতুন, তার মেয়ে, ঢাকায় বুলবুল লালিতকলা একাডেমীতে নাচ শিখত, এসএসসি দিয়ে বসে আছে, তাই রংপুরে বাবার কাছে এসেছে, একটা ফাংশানে নেচেছে, সাংঘাতিক নাচে, এখন গানের গলা আর অভিনয় প্রতিভাটা থাকলেই হয়ে গেল।

মুক্তি গ্রুপে এলো। দেখল মোনার অভিনয়। সে কিছুই বলল না। উঠে চলে গেল।

রেজা স্যারের বাড়ি গেল সে। স্যার বাসায় আছেন?

আছেন। আসেন। গৃহভৃত্য দরজা খুলে দিল।

মুক্তি এসেছ? রেজা স্যারের গলায় খুশির ঝরনা। এসো এসো। কী খবর বলো? কেমন লাগল রাণু ও ভানু।

ভালো লাগছে স্যার।

এনেছ বইটা সাথে। দেখো তোমাকে দেখাই। পৃষ্ঠা ১৬০। এলমহার্স্টকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, *তুমিই তো এ নাটকের নায়ক।*

আরও বেশি বিস্মিত হয়ে এল্‌মহার্স্ট বলল, মাই গুডনেস। নায়ক? আমি? আপনার নাটকের? আপনি রসিকতা করছেন আমার সঙ্গে!

কবি বললেন, তুমি রঞ্জন। নাটকের কেন্দ্রে আছে আমাদের রাণু, তার নাম নন্দিনী, সে তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকে। আর জালের আড়ালে রয়েছে অদৃশ্য রাজা, রঞ্জনের সঙ্গেই তার প্রধান প্রতিযোগিতা। আমি এ নাটকটাকে ঠিক রূপক বলতে চাই না।

দেখলে। আচ্ছা বাদ দাও। তোমার খবর কী? তৌফিক তো ঢাকায় গিয়ে আমাকে একদম ভুলেই গেল। তোমাকে ফোনটোন করে?

আমার তো ফোন নাই। কোথায় করবে?

তুমি করো?

না।

করো। আমার এখান থেকেই করো।

মুক্তি তার ব্যাগ থেকে তৌফিকের মোবাইল নাম্বার বের করল। ফোন করল। রিং হচ্ছে। কেউ ধরছে না। আবার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ পর ধরল। তৌফিকেরই গলা।

হ্যালো, তৌফিক ভাই, আমি মুক্তি, রংপুর থেকে।

ও মুক্তি! সুইটহার্ট, আমি যে এখন ক্যামেরার সামনে। তুমি আধা ঘন্টা পরে করো।

আমি চিঠি দিছি। আপনি পান নাই

কথা শেষ হলো না। লাইন কেটে গেল।

কাজের ছেলে চা দিয়ে গেল। রেজা স্যার বললেন, বসো, চা খাও। সিডি প্লেয়ারে তোমাকে একটা গান শোনাই। সিডি প্লেয়ারের একটা সুবিধা কী জানো, তুমি যে গানটা শুনতে চাও, ঠিক সেটাই শুনতে পাবে। এই যে তিন নম্বর গানটা এখন আমরা শুনব...সুমন চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে...

তোমায় গান শোনাব, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো,
ওগো দুখ জাগানিয়া।
এল আঁধার ঘিরে
পাখি এল নীড়ে
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ও গো দুখ জাগানিয়া...

গান হচ্ছে। গান শুনে মুক্তির কান্না পাচ্ছে। সে তাকিয়ে দেখল, রেজা স্যারের চোখ দুটোও ভেজা।

পরের দিন আবার তৌফিক আহমেদের মোবাইলে ফোন করল মুক্তি। মোবাইল ফোনের দোকান থেকে। এবারও ধরলেন তৌফিক আহমেদ।

মুক্তি বলল, তৌফিক ভাই, মুক্তি।

মুক্তি তুমি কেমন আছ। শোনো আমাকে তোমার একটা নাম্বার দাও। আমি পরে ফোন করব। এখন একদমই ক্যামেরার সামনে।

মুক্তি বলল, আপনাকে আর ফোন করতে হবে না। সে ফোন কেটে দিয়ে দোকানদারের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে চলে এল বাসায়। কাঁদতে কাঁদতে।

ভাবি বললেন, মুক্তি শোনো, খালা ফোন করেছিলেন। রয়েল তো তোমাকে বিয়ে না করলে কাউকেই বিয়ে করবে না বলে দিয়েছে। তুমি আরেকবার ভেবে দেখো। কালকে আমি না করে দিই।

মুক্তি বলল, না।

না মানে?

আমি রাজি। আমি রয়েল সাহেবকেই বিয়ে করতে চাই। এই কথা বলতে পেরে মুক্তির খুবই ভালো লাগল। চারপাশটা কেমন যেন চেপে আসছিল। তার নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। স্বরবর্ণ থিয়েটার নতুন নন্দিনী পেয়ে গেছে। বায়েজিদ তার ওপরে রাগ। তৌফিক আহমেদ তার সঙ্গে এই রকম একটা ঢাকামো করল। মানুদা পর্যন্ত তাকে একবার অনুরোধ করল না নন্দিনী করার জন্যে। তাহলে আর সে কেন বিয়েতে না করবে? সে অবশ্যই বিয়েতে রাজি। বিয়ে করে সে রয়েল সাহেবের বাড়ি পাবনা চলে যাবে। বিয়ের খবরটা শুনে বায়েজিদ আর মানুদার মুখের অবস্থাটা কেমন হবে, ভাবতেই মুক্তির এক ধরনের আরাম বোধ হলো।



রিহার্সাল ভালোই চলছিল স্বরবর্ণ থিয়েটারের। এডিসি জেনারেলের মেয়ে শুক্লা নন্দিনী চরিত্রটা ভালোই করছে। নাচের মেয়ে ভালো করবারই কথা। এডিসি সাহেবের স্ত্রী নিজে এসে বসে থাকেন মহড়াকক্ষে। শুধু রহমান নামের নবাগত ভদ্রলোক, যিনি দশ হাজার টাকা চাঁদা দিতে রাজি হয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ করে বলে বসলেন, আমি টাকাটা দিতে পারছি না। আমার একটু ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হচ্ছে। মানুদা ভাবলেন, কত কিসিমের মানুষই না থাকে দুনিয়ায়। মুক্তির ভক্ত আমি আছি, বায়েজিদ আছে, রেজা স্যার নতুন যুক্ত হয়েছে, আর রহমান সাহেব দেখা যাচ্ছে নীরব প্রেমিক। মুক্তি যদি নন্দিনী করত, তাহলে সে ঠিকই দিত দশ হাজার টাকা। মুক্তি করছে না। সেও টাকাটা দিচ্ছে না। যাই হোক, টাকার জন্যে তো ঠেকে থাকবে না।

সবাই প্রথমে এডিসি জেনারেলের মেয়ের সঙ্গে অভিনয় করতে একটু দ্বিধান্বিত ছিল, একটু জড়তা এসে যাচ্ছিল, আস্তে-আস্তে সবকিছু ঠিক হয়ে যাচ্ছে। মানুদা তার নির্দেশকের ছন্দ ফিরে পেয়েছেন, বায়েজিদ বিশু চরিত্রে প্রথম দিকে ঢুকেছিল কী এক খোলসের মধ্যে, আস্তে-আস্তে সেও গলা খুলতে শুরু করেছে; এখন যখন সে গান ধরে, তোমায় গান শোনাব, তখন মহড়াকক্ষটা গমগম করে ওঠে।

ঠিক এরই মধ্যে খবর এলো, মুক্তির বিয়ে। মুক্তির ভাবি নিজে সবাইকে ফোন করে খবর দিলেন। বায়েজিদকে, মানুদাকে। আপনাদেরই তো মেয়ে। বিয়ের খায়-খাটুনি এসব তো গ্রুপের ছেলেমেয়েদেরকেই করতে হবে।

বিয়ে? মুক্তির? কার সাথে?

ওর খালাতো ভাই রয়েলের সাথেই। ছেলের বাড়ি পাবনা।

মানু বলল, বুঝলে বায়েজিদ, মুক্তি শোধ নিচ্ছে।

বায়েজিদ বলল, আমার কিছু ভালো লাগতেছে না মানুদা। আমার কিছু ভালো লাগতেছে না।

রেজা স্যার ডেকে পাঠিয়েছেন মানুদাকে। মানু, মুক্তির নাকি বিয়ে?

জি স্যার।

হ্যাঁ। ওর ভাই-ভাবি এসে আমাকে কার্ড দিয়ে গেল। দেখে তো আমি স্তম্ভিত। ও হলো তোমাদের দলের নন্দিনী। ওর বিয়ে হয়ে গেলে থাকবে কী? বসো। রেজা স্যার জানালার পর্দা লাগিয়ে দিলেন ভালো করে। তারপর বললেন, ভালো হুইস্কি আছে। আসো খাই। খেতে খেতে গল্প করি।

তারা গেলাস উঁচিয়ে চিয়ার্স করলেন। রেজা স্যার বললেন, বুঝলে মানু, আজ আমার নিজেকে রবীন্দ্রনাথ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার রাণুর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। মানু। তুমি এই গানটা পারো? তোমায় গান শোনাব...

পারি। আমি ডিরেক্টর। আমাকে তো পারতেই হবে। দু পেগ পেটে পড়ায় মানুদার কণ্ঠে গান ফুটল ভালো। তোমায় গান শোনাব। গান শেষ করে মানুদা বলতে লাগলেন, আমি রাজা। আমি নন্দিনীর রাজা। আমি যদি নন্দিনীকে না পাই, তবে কেউ পাবে না। রঞ্জন কে? কে রঞ্জন? রঞ্জনকে মরতে হবে। রঞ্জনকে মরতে হবে। বায়েজিদ রঞ্জন নয়। বায়েজিদ হলো বিশু। ও গান গাইবে। নন্দিনীর ফুল পাবে। কিন্তু নন্দিনীকে পাবে না...

বসন্ত আসন্ন। এরই মধ্যে আমের গাছে মুকুল ধরেছে। গন্ধে চারদিক মউ মউ করছে। একটা কোকিলও এসে জুটেছে কোত্থেকে।

আর কী সুন্দর দখনে বাতাস বইতে শুরু করেছে।

বসন্তকালটা সত্যি সুন্দর।

ভাবি উঠেছেন ভোরবেলা। তিনি ধীরে ধীরে গেলেন মুক্তির ঘরে। একটা ক্যাসেট প্লেয়ারে ছেড়ে দিলেন শানাইয়ের সুর।

মুক্তি ঘুমুচ্ছে।

তিনি ধীরে ধীরে ডাকলেন, মুক্তি!

জি ভাবি।

ঘুম ভাঙছে?

জি ভাবি আসো। বসো।

ওঠো। নামাজ পড়ো। ফজরের নামাজটা পড়লে মন ভালো লাগবে।

মুক্তি উঠে বসল।

শোনো। তোমার বর এসে গেছে। ওরা রাতে রওনা দিয়েছিল। ভোরবেলা এসে হাজির।

কোথায় উঠেছে? আমাদের বাসায়?

ফুপুর নতুন বাসায় ওঠাইলাম। একটা মাইক্রোবাস নিয়ে আসছে। সব ছেলে। খালা-খালু কেউ আসে নি। অনুষ্ঠান তো আসলে হবে পাবনায়। এখানে শুধু আকদ। তোমার ভাগ্যটা ভালো। ভালো বর পাচ্ছ। মুক্তি শোনো। তোমার মনটা খুব খারাপ দেখি। মন খারাপ করে থাকো কেন? তোমার কি বিয়েতে কোনো আপত্তি আছে?

না। আপত্তি থাকবে কেন? শুধু তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে, এটা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।

ভাবিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল মুক্তি। তারা দুজনে কাঁদতে লাগল বুক ভাসিয়ে।

কান্নাকাটির পালা শেষ করে মুক্তি বেরিয়ে পড়ল বাসা থেকে। সকাল সকাল। একটা রিকশা ভাড়া করল। তারপর সোজা চলে গেল বায়েজিদের বাসায়।

বায়েজিদের দরজায় কড়া নাড়ল।

কেউ একজন দরজা খুলল। অচেনা। মুক্তি বলল, বায়েজিদ ভাই আছেন?

আছে।

লোক অন্তর্হিত। একটু পরে বায়েজিদ এলো। মুক্তি তুই?

মুক্তি বলল, তোর কাছ থেকে বিদায় নিতে আসলাম। আজকে দুপুরে আমার আকদ। তারপর আমরা পাবনার দিকে রওনা দিব।

বায়েজিদ বলল, এ-কথা বলতে তুই চলে আসছিস।

মুক্তি বলল, দাঁড়ায়া থাকব নাকি? কোথাও বসে একটু কথা বলা যাবে?

আয় ভেতরে আয়। ড্রয়িং রুমে ঢুকল তারা। মেঝেতে মশারি। কেউ শুয়ে ছিল। বায়েজিদ মশারি খুলে সরিয়ে রাখল।

মুক্তি বলল, বায়োজিদ ভাই, আমার শ্বশুরবাড়িতে যাস। সবাই মিলে যাস। আমি তোদের সাথে নাটক করতাম। চুরিচামারি তো আর করতাম না।

বায়েজিদ করুণ গলায় বলল, পাগলি। যাব। ঠিক আছে।

আর এই যে তোর জিনিস তোকে দিতে এসেছি।

কী?

মুক্তার মালাটা।

এটা নিয়ে আমি কী করব?

বান্দরের গলায় মুক্তার মালা।

তাই তো।

আমার কথা মনে করবি। মুক্তার মালা দেখলে মনে হবে আমি মুক্তা

একসময় তোদের দলে ছিলাম। তোদের সাথে নাটক করতাম। তখন ভালো করে নাটক করবি।

স্মৃতি তুমি বেদনা না হয়ে যায়।

তারা হাসে। তাদের প্রত্যেকের চোখে জল।

যাই। বরপক্ষ এসে গেছে। তাদের কানে আবার কেউ ভাঙানি দেবে।

ঠিক আছে যা।

মুক্তি যে রিকশায় এসেছে, সেটাতেই যাচ্ছে। আর বায়েজিদ তার চলে যাওয়া দেখছে।

তার মনের ভেতরে গান বাজছে— তোমায় গান শোনাব, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো ওগো ঘুম ভাঙানিয়া...



তৌফিক আহমেদের এই কটা দিন যে কীভাবে গেছে! রংপুরে গিয়ে সময় নষ্ট করাটা একদম উচিত হয় নাই। এখন তিনি তিন শিফটে কাজ করেও কাজ নামাতে পারছেন না। এর মধ্যে আবার একটা পত্রিকার পারফরমেন্স এ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানে তাকে বলেছে নাচতে। সেই নাচের রিহার্সালেও যেতে হচ্ছে এক ফাঁকে।

মুক্তির কথা তার মনে হয় নাই, তা নয়। খুব মনে হয়েছে। বারবার ভেবেছেন ফোন করবেন। কিন্তু ফাঁক মেলে নাই। আর তা ছাড়া মেয়েটার বাড়িতে ফোন নাই। মোবাইলও নাই। পাশের বাসায় ফোন করে প্রথমে ডাকতে হবে। তারপর আবার ফোন করতে হবে। এই কদিনের ব্যস্ততায় সেই কাজটাই করা হয়ে ওঠেনি।

আজ দুপুরে কোনো কাজ নাই। শুটিং নাই। আজকে ফোন করা যায় রংপুরে। মুক্তির কাছে। তৌফিক আহমেদ পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ বের করলেন। মুক্তিদের পাশের বাসার একটা টেলিফোন নাম্বার তার কাছে আছে। তিনি ফোন ঘোরালেন।

কেউ একজন ধরল।

হ্যালো। আপনাদের পাশের বাসায় মুক্তিকে একটু ডেকে দেয়া যাবে?

মুক্তি? মুক্তির তো আজকে বিয়ে। দুপুরে।

যাহ। ইয়ারকি করেন কেন?

ইয়ারকি না। সত্যি বিয়ে। পাত্রর নাম রয়েল। পাবনায় বাড়ি।

কী বলে? পাত্রের বাড়ি পাবনা হবে কেন, এই খবর শোনার পর তো তৌফিকেরই পাবনা যাওয়ার যোগাড়। তৌফিক ফোনের নম্বর টেপেন আবার। এবার ফোন করলেন রেজা স্যারের বাড়ি।

রিং হলো। ফোন ধরল দীপ্র।

হ্যালো...দীপ্রর গলা।

হ্যালো, পপআই, তোমার বড় আব্বা কই?

ব্লুটো। তুমি কোথায়? তুমি জানো, আমার খুব মন খারাপ।

কেন?

অলিভের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তো তাই।

তোমার বড়আব্বাকে দাও।

বড় আব্বা তোমার ফোন। দীপ্র ফোন এগিয়ে দিল রেজা স্যারের দিকে।

রেজা স্যার ফোন ধরলেন। হ্যালো।

স্যার কেমন আছেন?

না। মনটা ভালো নেই।

স্যার মুক্তির কোনো খবর জানেন।

ওর তো বিয়ে আজকে। ছেলে পাবনা থাকে। বাড়িটাড়ি আছে। তবে আর্ট কালচার বোঝে বলে মনে হয় না। দাওয়াত দিয়েছে। যাব দুপুরবেলা। আকদ। বেশি বড় অনুষ্ঠান না। কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে।

রাখি স্যার। মুক্তির সঙ্গে দেখা হলে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিবেন।

ফোন রেখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন রেজা স্যার। আগের রাতে হুইস্কিটা বেশ জমেছিল। এখনও মাথা ধরে আছে। হ্যাঁ। একটু পরে যাবেন তিনি। মুক্তি মেয়েটাকে তুলে দিতে হবে বরের হাতে। মেয়েটা বড় দুখী। জন্মের সময় মা মরে যায়। বাবা মারা গেছে শৈশবে। ভাইয়ের ঘরে থাকে। তিনি ফোন করলেন মানুদাকে। মানু ইদানীং বাসায় টিএন্ডটির ফোন নিয়েছে।

হ্যালো, মানু নাকি।

জি, কে?

রেজা স্যার বলছি।

স্যার।

বিয়েতে যাবে না?

যেতেই তো হবে স্যার।

চলো যাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে করে দ্যাখো। রাণুর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতন থেকে কবি আনালেন গায়ক-গায়িকার দল। শুভ দৃষ্টির আগে বরের চারপাশে কনেকে সাতপাক ঘোরানো হলো, গায়ক-গায়িকারা গান ধরল, একটু দূরে বসে সব দেখছেন কবি। আমাদের কী! অবশ্য তুমি তো আবার রাজা। তুমি তো তোমার নিজের তৈরি করা যক্ষপুরী ভেঙে ফেলতেও পারো।

মানুদা বললেন, স্যার। আমি রাজা। আবার আমি পরিচালক। পরিচালকের একটা আশ্চর্য সাইকোলোজি আছে স্যার, যখন নাটক চলে, তখন সবকিছু হয় পরিচালকের ইচ্ছায়, কে কতটা হাসবে, কতটা কাঁদবে, কে কী পরবে, কোনদিকে তাকাবে, তারপর যখন নাটক শেষ, তখন সবকিছু জগতের নিজের নিয়মে হতে থাকে, পরিচালকের নির্দেশের অপেক্ষা কেউ করে না, তখন কিন্তু পরিচালক খুব

অস্বস্তি বোধ করেন। পরিচালকরা তাই সব সময় চান শো চলুক, বা রিহার্সাল হোক। আমার মনে হচ্ছে, আরে আমি পরিচালক, অথচ আমার আদেশ ছাড়াই একটা দৃশ্য হতে চলেছে, এটা কী ধরনের কথা, এই দৃশ্য তো আমি অ্যাপ্রুভ করি নাই। এখন আমার মনে হচ্ছে, আরে আমার নাটকের শিল্পীর বিয়ের দৃশ্য তো আমি করতে বলি নাই, এটা হচ্ছে কীভাবে।

মানু, তোমার আমার ওপরে তো আরেকজন নাট্যকার আছেন। তাকে তুমি ভাগ্য বলো আর ভগবানের ইচ্ছা বলো, আছে না। সেই স্ক্রিপ্টের বাইরে তো জগতে আমরা চলতে পারি না। তাই না। মন খারাপ কোরো না। চলো যাই। মেয়েটাকে তুলে দিয়ে আসি।

বিয়ের পর্বটা নির্বিঘ্নেই ঘটল। বাড়ির ভেতরেই সব আয়োজন। কাজি সাহেব বিয়ে পড়ালেন। বিয়ের কাবিননামায় বর-কনের সই নিলেন। তারপর উপস্থিত বরযাত্রী ও অভ্যাগতদের পোলাও-মুরগির রোস্ট ও খাসির রেজালা খাইয়ে দেয়া হলো। বুটের ডালে ঝাল বেশি হয়েছিল, তা ছাড়া আর কোনো অভিযোগ ওঠে নাই। বরের বাড়ি অনেক দূর, পাবনা, বেশি দেরি করা ঠিক হবে না, তাড়াতাড়িই বিদায় দাও কনেকে। মুক্তির বড়ভাই ডিশ হাফিজ, সঙ্গে রেজা স্যার ও মানুদা পাত্রীকে পাত্রের হাতে সমর্পণ করলেন। বায়েজিদ বিয়ে বাড়ির আশপাশেই আসে নাই। বরপক্ষ একটা কার ও একটা মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছিল। সেই গাড়িতে বরের পাশে বসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে মুক্তি ভাইয়ের বাড়ি ও রংপুর ছাড়ল।

সন্ধ্যার পর শোনা গেল দুঃসংবাদ। বিয়ের গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে। মিঠাপুকুরের কাছে। একজন স্পট ডেড। আহতদের নেয়া হয়েছে রংপুর মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে।

খবর পেয়ে মানুদা ছুটলেন হাসপাতাল অভিমুখে। সাইকেলে। গ্যারাজে সাইকেল রেখে গেলেন জরুরি বিভাগে।

গিয়ে দেখতে পেলেন, লাল বেনারসি পরা মুক্তি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে, একটা বেডে একটা রক্তাক্ত দেহ। বিয়ের শেরওয়ানি পরা। সাদা শেরওয়ানি লাল হয়ে গেছে।

মানুদা মুক্তির পাশে দাঁড়ালেন। ভিড়। ডেটলের গন্ধ। সন্ধ্যা।

মুক্তি বলল, মানুদা এ কী হইল মানুদা!



রেজা স্যার যখন শুনলেন দুঃসংবাদটা, ফোনে, তখন তিনি হুইস্কিতে। তিনি বললেন, রাজা, তুমি রঞ্জনকে মেরে ফেললে রাজা। রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জানো, ওকে জাগিয়ে দাও।

ভাবি, মানুদা, বায়েজিদ, মুক্তির ভাই সবাই মিলে ধরে মুক্তিকে বাসায় নিয়ে এলো। মুক্তি কোনো কথা বলল না। কাঁদল না একটুকু।

ভাবি তাকে ঘরে আনল।

আরও মেয়েরা এলো।

একজন মুরব্বি মহিলা বললেন, হায়াৎ মউত সব আল্লার ইচ্ছা। যার যেখানে মরণ লেখা আছে হবে। তুমি মা কাপড়চোপড় বদলে কোরান তেলাওয়াত করতে বসো। রুনা (ভাবির নাম) তুমি ওকে একটু নামাজের কাপড় পরায়া দাও। আর শোনো মানু, ওদের সুটকেসটা মনে হয় থানায় আছে, তোমরা সামলাবা।

ভাবি মুক্তির বেনারসি শাড়ি, গা ভরা গয়না খুলে তাকে পরিয়ে দিল একটা সাধারণ শাড়ি, একেবারে সাদা না হলেও সাদামাটা।

মুক্তি ছিল স্বরবর্ণ থিয়েটারের নন্দিনী, ওকে ঘিরেই জেগে উঠেছিল স্বরবর্ণ থিয়েটার, ওর কারণেই ছেলেরা নিয়মিত আসত মহড়ায়, পাড়ার ছেলেরাও হয়ে উঠেছিল ফ্যাশান-সচেতন, সংস্কৃতি-মুখর, তিনজন যুবক অন্তত হয়ে উঠেছিল কবি, মুক্তির অজান্তেই। এখন মুক্তি, রংপুর শহরে হয়ে উঠল অপয়া, রংপুরের ভাষায় কুসাইতা। মুক্তি জন্মের সময় মেরেছে তার মাকে, এখন বিয়ের দিনেই মারল স্বামীকে। মুক্তি স্তব্ধ হয়ে গেছে এই আঘাতে। নতুন বরের সঙ্গে তার কোনো কথাই হয়নি, সে তার খালাতো ভাই রয়েল, পাবনায় থাকে, ছোটবেলায় দেখেছে অনেক, বড় হয়ে রয়েলের সঙ্গে তার যে-কোনো ভাব বিনিময় হয়েছিল, তা নয়, কাজেই রয়েলের জন্যে তার কোনো অতিরিক্ত শোক নাই, কিন্তু নিজে সে কুইসাইতা, আর জনম-দুখিনী, সেটা ভাবতেই দুঃখে তার প্রাণটা কেঁদে উঠতে লাগল।

এদিকে এডিসি জেনারেলের মেয়ে শুক্লা ঢাকা ফিরে গেছে। তার বিদেশে

স্কলারশিপ হবার কথা ছিল, সেটা হয়ে গেছে, সে বিদেশ চলে যাচ্ছে, বিদেশে সে লেখাপড়া করবে, আর বাঙালি সংস্কৃতি তুলে ধরবে বিশ্ববাসীর সামনে। কাজেই রংপুরের স্বরবর্ণ থিয়েটারের নন্দিনী হওয়া আর তার হলো না।

কিন্তু স্বরবর্ণ থিয়েটারের নিবেদিত-প্রাণ কর্মীরা এত সহজেই হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন।

মানুদা গেলেন মুক্তির বাড়িতে। ভাবি দরজা খুললেন। মানুদা সালাম দিলেন, স্লামালেকুম। ভাবি মুক্তার কাছে এসেছিলাম। আপনার শরীরটা ভালো?

আছি বোঝেনই তো এত বড় একটা দুর্ঘটনা। মেয়েটাও বিধবা হলো। বাসরটা পর্যন্ত হলো না। আপনারা আমাদের জন্যে অনেক করছেন। থানাপুলিশ হাসপাতাল, আপনাদের হেল্প ছাড়া কষ্ট হতো।

না আমরা আর কী করলাম?

আপনি করেছেন। বায়েজিদ করেছে। বসেন। মুক্তিকে ডেকে দেই।

মুক্তি এলো। দেখে ভীষণ খারাপ লাগল মানুদার। মুক্তি সাদা শাড়ি পরে আছে কেন? রক্তকরবীর নন্দিনী— ও পরে থাকবে আগুন রঙের শাড়ি, ওকে কি এই হিন্দু বিধবার বেশ মানায়?

এসো মুক্তি। বসো।

আপনারা সবাই ভালো আছেন তো মানুদা।

আছি।

রিহার্সাল চলতেছে?

মধ্যখানে তো তোমার অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। কয়েক দিন বন্ধ ছিল। এখন আবার সবাই আসতে শুরু করেছে। কিন্তু জমছে না। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, তুমি ছাড়া ওই ক্যারেক্টারে আর কাউকে মানাচ্ছে না। আমরা অপেক্ষা করছি, তুমি কবে আবার আসতে শুরু করো। কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনাল, কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমাদের চলছে না।

আমাকে ছাড়া? আমি বড় অভাগি মেয়ে মানুদা। আমার জন্মের সময় আমার মা মরি যায়। এখন আমাকে বিয়ে করতে না করতেই একটা জলজ্যান্ত লোক মরি গেল। গাড়িতে তো আরও অনেকে ছিল। কারও তেমন কিছু হইল না, আমাকে বিয়ে করছে বলিয়া লোকটা মরি গেল। ভাবেন আমি কী রকম!

মুক্তি কাঁদতে লাগল।

মানুদা মুক্তির মাথায় হাত রেখে বললেন, ছি-ছি। এ রকমভাবে ভাবছ কেন? দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। তুমি থিয়েটার করা মেয়ে। তুমি যদি এমন কুসংস্কার ছড়াও, তাহলে অন্যদের কাছে আমরা কী আশা করব?

এসব কি আমি শখ করে বলতেছি। অনেক দুঃখ থেকে বলতেছি। মানুদা, সরি বসেন। ওখানে ইলেকট্রিকের তার বার হয়া আছে। ভয় লাগে।

মানুদা চমকে উঠলেন, পরে দেখে নিয়ে বুঝলেন তার অনেক দূরে, বললেন, আরে না এতে কিছু হবে না।

জানেন এখন আমি ইলেক্ট্রিক সুইচে হাত দিতেও ভয় পাই। মনে হয় শক খাব। ছাদে উঠতে ভয় পাই। মনে হয় পড়ি যাব।

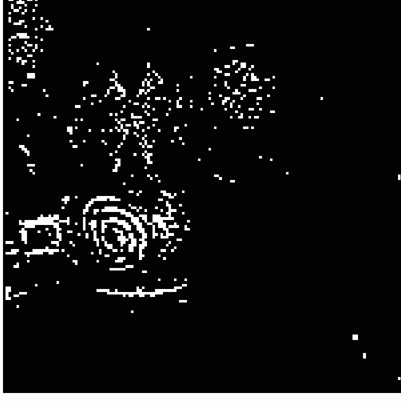
একা একা ঘরে বসে থাকলে এ-রকম আরো বেশি বেশি করে মনে হবে। তার চেয়ে তুমি আমাদের রিহার্সালে আসো। তোমাকে ছাড়া আমরা নাটকটা করতেও পারছিলাম না।

ক্যান? এডিসি স্যারের মেয়ে।

ও দুদিনের অতিথি। এসেছিল। চলে গেছে।

ঠিক আছে। যাব। বায়েজিদ ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েন তো। অনেক দিন আসে না। ব্যাপার কী?

বায়েজিদকে? আচ্ছা, পাঠিয়ে দেব। আজকে তাহলে আসি। বুধবারে রিহার্সাল আছে। তুমি এসো।



বায়েজিদ যায় না মুক্তির কাছে। মানুদা চিন্তিত। কেন যায় না। তিনি ফোন করলেন বায়েজিদকে।

বায়েজিদ, তুমি মুক্তির সাথে দেখা করো না কেন?

কে বলছে দেখা করি না। করি তো।

মুক্তি নিজে আমাকে বলেছে।

দেখা করি না। এই এমনি।

এখন মেয়েটা একটা কষ্টের মধ্যে আছে। প্রচণ্ড কষ্ট। এর মধ্যে তোমার কর্তব্য হলো তার পাশে যাওয়া। আর এই সময় তুমি তাকে এড়িয়ে চলছ। এটা ঠিক নয়।

আমি জানি ঠিক নয়। কিন্তু মানুদা আমার কেমন যেন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।

কেন, তোমার কেন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হবে?

আমি তো চাই নি এ বিয়েটা হোক। তাই মনে হয়, মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অশুভ চাওয়া ছিল না তো!

তাহলে তুমি আমাকেও দায়ী করতে পারো। এভাবে আমাদের একটা ভালো পারফরমার চলে যাক, এটা আমিও চাইনি। কিন্তু আমি তো দায়ী না।

দি ওয়ার্ল্ড ইজ আ স্টেজ অ্যান্ড মেন অ্যান্ড উমেন মেয়ারলি পারফরমারস।

ঠিক ঠিক। কিন্তু বায়েজিদ ইংরেজি বলো না। ইংরেজি বললে তাকে আমার কেমন পাগল পাগল লাগে। ওই যে ইঁদারার মোড়ের ইয়াসিন পাগলের মতো। সারাক্ষণ কেমন ইংরেজি কোটেশন ঝাড়ে।

ঠিক ঠিক। তার বদলে বাংলা গান শোনানো ভালো। খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট ও শিশু আনমনে। বায়েজিদ গান ধরল।

মানুদা বলে দিয়েছিলেন— বায়েজিদ তুমি বুধবার বিকালে নিজে যাবে। গিয়ে মুক্তিকে নিয়ে আসবে। ও যেভাবে সবকিছুতে ভয় পাচ্ছে, ও তো অসুস্থ হয়ে যাবে।

বহুদিন পর বায়েজিদ আবার এলো মুক্তির বাড়িতে। মুক্তিকে দেখে তার রক্তের

ভেতরে ছলক দিয়ে উঠল, যেমন আগে দিত। মুক্তি অনেক শুকিয়ে গেছে, তার মুখাবয়বে একটা বিষণ্নতা, মুক্তিকে আরও সুন্দর দেখা যাচ্ছে, অনেক সুন্দর। মুক্তি বলল, বায়েজিদ ভাই, একটু দাঁড়াও, আমি আসতেছি।

মুক্তি তো তাকে আগে তুই করে বলত। এখন তুমি করে বলছে কেন?

মুক্তি বেরিয়ে এলো তৈরি হয়ে। ওরা একটা রিকশায় উঠল।

বায়েজিদ ভাই, তোর পাশে কখনও আবার এক রিকশায় বসা হবে, স্বপ্নেও ভাবি নাই। এই রিকশা বাম দিক দিয়ে যান। ইস ট্র্যাকগুলো কেমন গায়ের ওপরে এসে পড়ে। ঠিকভাবে চালায়েন ভাই।

বায়েজিদ স্বস্তিবোধ করল, কারণ মুক্তি আবার তুইতে ফিরে এসেছে। বলল, তুই তো অনেক ভীতু হয়ে গেছিস। হবারই কথা।

তুই আমাকে এ কদিন এড়ায়া চললি কেন? তুই কী ভাবিস, একটা বিধবা এসে আমার ঘাড়ে চাপতেছে?

ছি-ছি-ছি। এসব তুই কী বলতেছিস মুক্তি। আমার সঙ্গে তোর পরিচয় তো কম দিনের না। আমাকে তোর এ রকম মনে হলো?

বিধবা মানুষ। অল্পদিন হলো স্বামী মারা গেছে। জন্মের সময় মা মারা গেছে। মাথার ঠিক নাই। উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেললে মাফ করে দিস। তবে আমি কিন্তু কারও ঘাড়ে চাপতে চাই না। আমাকে এড়ায়া না গেলেও চলবে।

যা না তাই তুই বলতেছিস। তোর আসলেই মাথার ঠিক নাই।

কেরানিপাড়া। ডিসির বাড়ির মোড়। কাছারিবাজার। পুলিশ লাইন। টাউন হল। পেছনে স্বরবর্ণ থিয়েটারের কার্যালয়। রিকশায় করে আসতে কতক্ষণ আর লাগে!

তারা ভাড়া দিয়ে নেমে গেল দপ্তরের ভেতরে। দরজায় সব স্যান্ডেলের ভিড়।

ভেতরে রিহার্সাল চলছিল।

হারমোনিয়াম তবলা-যোগে গান হচ্ছিল।

মুক্তি ঢুকতেই গান থেমে গেল।

মুক্তি বলল, কী ব্যাপার, গান থামল কেন? আরে আশ্চর্য তো। গান গাও। গান গাও। কী আশ্চর্য না। আজকে আমার থাকার কথা শ্বশুর বাড়ি। আজকে আমি আবার চলে আসলাম এখানে।

স্বরবর্ণ থিয়েটার তো আমাদের অনেক ভালোবাসার থিয়েটার। তারই টানে আসছি।

মানুদা বললেন, আসলে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনটাকে যে আমরা কত

ভালোবাসি, আজকে মুক্তির কথায় আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারছি। যাক, মুক্তি আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছে। আমরা সব সময়ই চেয়ে এসেছি সে আমাদের মধ্যে ফিরে আসুক। কিন্তু আমরা কখনও চাইনি যে এ রকম দুঃখজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে সে আমাদের মধ্যে ফিরুক। যাক ঘটনা যা ঘটেছে তার ওপরে তো আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমরা ঘটনার জন্যে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করছি। মুক্তিকে ফিরে পেয়ে আমরা যে খুব খুশি হয়েছি, সেটা আমরা তাকে জানিয়ে রাখছি।

রিহার্সাল ভালোই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্তি তার পুরোনো ছন্দ ফিরে পেল। তখন সবাই বলাবলি করতে লাগল, শুক্লাকে দিয়ে আসলে নন্দিনী হতো না।

সবকিছুই আবার আগের মতো ঠিকঠাকমতো চলতে শুরু করেছে। এমনকি রহমান সাহেব পর্যন্ত ফিরে এসেছেন। তিনি কোনো শর্ত ছাড়াই দশ হাজার টাকা চাঁদা দেবেন। তার কোনো শর্ত নাই। বায়েজিদ হেসে মুক্তির কানে-কানে বলল, তোর আরেক গোপন প্রেমিক। তুই করবি না শুনে টাকা দিবে না বলে দিছল। এখন আবার আসছে। বলতেছে, ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস যা ছিল মিটে গেছে। এখন আমি টাকা দিতে পারি।

মানুদা তাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে বললেন, না-না। আপনি একবার দিতে চাবেন, আরেকবার বলবেন পারব না, এইভাবে তো চলে না।

রহমান সাহেব বললেন, আরে মানুষের ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হতে পারে না! আমারও হইছিল। এখন আর নাই। আমি দিচ্ছি।

পরের দিনই তিনি নগদ দশ হাজার টাকা তুলে দিলেন মানুদার হাতে। মানুদার বাড়িতে গিয়ে তাকে কতগুলো জাত নিমগাছের চারাও দিয়ে এসেছেন। মানুদা এখন রহমান সাহেবের ওপরে খুশি। তিনি ঠিক করেছেন, রঞ্জনের চরিত্রটা রহমান সাহেবকেই দেবেন। রঞ্জনের সুবিধা হলো কোনো সংলাপ নাই। শুধু মরে পড়ে থাকতে হবে। আর নন্দিনী তার হাতে ফুলের মালা পরিয়ে দেবে। মৃত সৈনিকের ভূমিকায় কাকে অভিনয় করতে বলা যায়? এই নিয়ে মানুদা একটু সঙ্কুচিত ছিলেন। দশ হাজার টাকা সমস্যার সমাধান করে ফেলল সহজেই।

তবে, রহমান সাহেবের দিক থেকে বিবেচনা করলে, এতটুকুন অভিনয় করতেও তাকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে। কারণ, প্রধানত মরে পড়ে থাকা সহজ নয়। তার ওপর নন্দিনীরূপী মুক্তি যখন তার শরীরের ওপরে ঝুঁকে পড়ে বলে, রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনও মরতে পারে না, তখন রহমান সাহেবের সমস্ত শরীরে সাড়া পড়ে যায়, রোমকূপ পর্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠে।

মহড়া শেষ হয়ে গেলে শাহিন আর মানুদা বাতি ফ্যান বন্ধ করে দরজায় তালা লাগিয়ে বের হলেন। সাইকেলটা নিলেন। দেখলেন মাঠের এককোণে রাস্তার ওপরে এক মেয়েমূর্তি।

কে? মোনা? তুমি এখনও যাও নি?

মোনা কাছে এলো। সে ফোঁপাচ্ছে। বোধহয় কাঁদছে। কী হয়েছে?

আমি আর গ্রুপ করব না। আমাকে নিয়ে আপনারা ফুটবল খেলছেন। একবার এ পোস্টে আরেকবার আরেক পোস্টে লাথি মারি পাঠাইছেন। শুক্লা গেলে আবার বললেন, আমি নন্দিনী করব। এখন ফির...

কী মুশকিল! তোমাকে রিহার্সাল দিয়ে রাখাই হলো স্টান্ডবাই হিসাবে। মুক্তি না করলে তুমি করবে। মুক্তি করলে তুমি অন্য ক্যারেক্টার করবে। এতে কান্নাকাটির কী আছে? পাগলামি করো না। যাও বাসায় যাও।

আপনিও আমার সাথে চলেন। আপনি আমাকে একদম ভালোবাসেন না। আপনি খালি ভালোবাসেন মুক্তিকে। আমি সব বুঝি।

আরে মেয়ে কে বলেছে আমি তোমাকে ভালোবাসি না। ঠিক আছে চলো তোমাদের বাসায় চলো।

মানুদা মোনার মাথায় হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন।

মাইকিং হচ্ছে শহরে। স্বরবর্ণ থিয়েটারের পঞ্চম প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ও বিকাশ চক্রবর্তী মানু পরিচালিত 'রক্তকরবী' রংপুরের ঐতিহাসিক টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে।

রিকশার সামনে মাইক বাঁধা। পেছনে পেছনে পথশিশুরা দৌড়াচ্ছে। কেউবা রিকশার পেছনের রডে উঠে পড়ছে।

মাইকে শোনা যাচ্ছে... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ও বিকাশ চক্রবর্তী মানু পরিচালিত এই চ্যাংড়াপ্যাংড়া নামো রিকশা থাকি, এই ধর তো রে...রক্তকরবী মঞ্চস্থ হবে।

শেষ পর্যন্ত আজ যবনিকা উঠছে। টাউন হলে প্রদর্শনী হচ্ছে রক্তকরবীর। রেজা স্যার প্রদর্শনীর উদ্বোধক। তিনি সবার আগে এসে বসে আছেন। গ্রিনরুমে সবাই ব্যস্ত মেকআপ নিতে। বাইরে ব্যস্ত কর্মীরা।

চানাচুরওয়ালা টাউন হলের মাঠে বড় বড় কেরোসিনের খোলা প্রদীপ ওরফে ল্যাম্পো জ্বেলে পসরা সাজিয়ে বসেছে।

ভেতরে হাউজফুল।

পর্দা উঠল।

একটা প্রদীপ জ্বেলে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন অধ্যাপক রেজাউন নবী।

গেটে এসে শো শুরুর পর ঢুকতে চাইছে দুজন।

গেটের কর্মী বলল, আপনাদের কার্ড।

আরে ভাই আমরা সাংবাদিক।

কোন পত্রিকার যেন?

আলোর ফাগুন।

আসেন আসেন। টর্চলাইট হাতে কর্মীরা তাদেরকে নিয়ে চলল ভেতরে, সামনের দিকে সাংবাদিক লেখা সারিতে তাদের বসানো হবে। সেখানে অসাংবাদিক বিশিষ্ট ব্যক্তি বসে আছেন। কী মুশকিল! মানুদাকে জিজ্ঞেস করা যায়, এখন কী করা হবে। কিন্তু মানুদা ভেতরে ব্যস্ত। রাজার সংলাপ তিনি বলে চলেছেন: *নন্দিনী তুমি কি জানো বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভেতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি না। আমি তোমাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।* রিহার্সালে এই সংলাপ অতীতে যতবার তারা শুনেছিল, এই কর্মী দুজন বলে উঠত, আমিও... এবারও তারা তাই করল।

রেজা স্যার প্রথম সারিতে বসে হা করে তাকিয়ে আছেন মুক্তির দিকে। সংলাপটা তার মনের মধ্যেও ঝড় তুলল। আহা, এই রকম করে যদি আমি বলতে পারতাম। রবীন্দ্রনাথ কবি। তিনি রাণুকে সরাসরি যা বলতে পারেননি, নাটকের সংলাপে তাই বলেছেন। রেজা স্যার তো কবি নন। তিনি কেমন করে বলবেন?

তবে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেন নি। তাই বা কী করে বলি। একবার রাণুকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেই ফেলেছিলেন, *তোমার জীবনে রাণু, যদি আমার মধ্যে সেই সদর দরজাটা খুঁজে পেতে, তাহলে খোলা আকাশের স্বাদ পেয়ে হয়তো খুশি হতে। তোমার অন্দরের দরজার অধিকার দাবি আমার তো চলবে না- এমনকি সেখানকার সত্যকার চাবিটি তোমার হাতেও নেই, যার হাতে আছে সে আপনি এসে প্রবেশ করবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি যা দিতে পারি, তুমি যদি তা চাইতে পারতে, তাহলে বড় দরজাটা খোলা ছিল। কোনও মেয়েই আজ পর্যন্ত সেই সত্যকার আমাকে সত্য করে চায়নি—যদি চাইত তাহলে আমি নিজে ধন্য হতুম। কেননা, মেয়েদের চাওয়া পুরুষের পক্ষে একটা বড় শক্তি। ...কতকাল থেকে উৎসুক হয়ে আমি ইচ্ছা করেছি, কোনও মেয়ে আমার সম্পূর্ণ আমাকে প্রার্থনা করুক, আমার খণ্ডিত আমাকে নয়। আজও তা হলো না—সেই জন্যই আমার*

সম্পূর্ণ উদ্বোধন হয়নি। কী জানি আমার উমা কোন দেশে কোথায় আছে। হয়তো আর জন্মে সেই তপস্বিনীর দেখা পাব।

আহা রবিবাবু স্পষ্টভাষাতেই তার মনের কথা বলেছেন। রেজা স্যার যদি তেমনি করে বলতে পারতেন!

প্রদর্শনী শেষ হলো।

পাত্রপাত্রীরা সবাই এসে সার বেঁধে দাঁড়াল, তারপর অভিবাদন জানাল নতমস্তকে; করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল টাউন হল।

দর্শকরা বেরিয়ে যেতে লাগল খোলা দরজাগুলো দিয়ে।

গ্রুপের সদস্যরা আর অভিনেতাদের স্বজনেরা উঁকি দিতে লাগল গ্রিনরুমে। রেজা স্যারও এগিয়ে গেলেন।

তিনি অভিনন্দন জানালেন মানুদাকে, আর বিশেষভাবে মুক্তিকে। বললেন, মুক্তি, তুমি শুধু খুব ভালো অভিনয় করেছ তাই না, তুমি আমাকে রক্তকরবীর নতুন মানে শেখালে, আর রবীন্দ্রনাথের জীবনটাও আমার কাছে আজ থেকে নতুন রকম লাগছে।

বায়েজিদ এগিয়ে এলো মুক্তির দিকে। ভাবি এলেন।

রেজা স্যার বায়েজিদকে বললেন, বায়েজিদ তুমি এত সুন্দর রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া শিখলে কার কাছে। খুব ভালো হয়েছে।

মুক্তি গেল মানুদার কাছে। মানুদা? হইল কিছু?

মানুদার চোখে জল। দেখছ না লোকে কত প্রশংসা করছে।

আবেগে মুক্তির চোখেও জল চলে এল। সে মানুদার পা ছুঁয়ে সালাম করল।



বায়েজিদ এসেছে মুক্তির বাসায়। সঙ্গে একটা বাঁদরওয়ালা। রাস্তার ধারে বাঁদরওয়ালা বাঁদরের খেলা দেখাচ্ছিল। তাকে সে রিকশায় বাঁদরসমেত তুলে নিয়ে চলে এসেছে মুক্তিদের বাসায়।

রিকশার ওপর বাঁদরওয়ালাকে বসিয়ে রেখে বায়েজিদ দোরঘণ্টি বাজাল মুক্তিদের বাসার।

মুক্তি বলল, বায়েজিদ ভাই, দুপুরবেলা, ব্যাপার কী?

এই তোর সাথে দেখা করতে আসলাম। দ্যাখ সাথে কাকে আনছি।

কে?

ওই যে রিকশায় বসে আছে। আমার যমজ ভাই। এনাকে বান্দর বলে। বানরও বলে। ভদ্রভাষায় শাখামৃগ।

ক্যান?

বান্দরের গলায় যাতে তুই মালা পরাতে পারিস।

মানে কী?

দুদণ্ড আমাকে না দেখে যদি তোর জান হাঁসফাঁস করে, তখন তুই এটাকে দেখবি। এর গলায় মালা-টালাও দিতে পারিস।

বায়েজিদ ভাই। তুই পারিসও। তোকে দেখলেই তো আমার এনাকে মনে পড়ে। ওনাকে দেখে আমার তোর কথা মনে করতে হবে না।

নানা। এটাকে আমি তোদের বাসায় তিনদিন রেখে যাব। সাথে লোক আছে। সে এসে দুবেলা এর যত্নআত্তি করবে। একে কলা খাওয়াবে। একে বাথরুম করাবে। টয়লেট পেপার-টেপার যা লাগে বুঝিস না...

জয়নাল ভাই, একে একটু ভেতরে রাখেন।

মুক্তি হেসে গড়িয়ে পড়ছে। তোর এখন কাজ কী?

তোর মনোরঞ্জন করা।

এ ছাড়া?

কেন বল তো।

তোর সাথে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করছে। বিধবা মানুষ। সবার সাথে তো আর বারাইতে পারি না।

কোথায় যাবি, চল।

এখনই যাবি।

চল।

তারা বাঁদরওয়ালাকে বিদায় করে দিয়ে রিকশা নিয়ে বেড়াতে বের হলো। কুকরুলের বিলের দিকে গেল তারা। একটা সুন্দর ছায়াঘন গাছ দেখে রিকশা ছেড়ে দিয়ে তার নিচে বসে পড়ল।

প্রচণ্ড রোদ ছিল একটু আগে। কোত্থেকে মেঘ করে এলো। বৃষ্টি পড়তে লাগল ঝুপঝুপ করে।

বিলের পানিতে বৃষ্টি পড়ছে। বিলের পানি গাল ফোলাচ্ছে।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জল পড়তে লাগল দুজনের গায়ে।

মুক্তি বলল,

কচুর পাতায় করমচা
যা বৃষ্টি চলে যা
কালকে আসিস
আজকে না।

বায়েজিদ বলল,

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে

মুক্তি বলল, এই মার খাবি, বৃষ্টিটা না কমলে কী হবে ভাবছিস?

বায়েজিদ বলল, মজা হবে। আমরা চিরটা জীবন এখানে বসে থাকব, এই তো তোর কাছাকাছি...

তাই থাকতে হবে।

মুক্তি, তুই কি আমাকে চিরকাল তুই তুই করবি?

অসুবিধা কী? কত মেয়ে তার বরকেই তুই তুই করে...

মুক্তি, আমার ছোটভাইটা পাস করে ফেলেছে। এখন বিয়ে করতে চায়। আমি আর বেশিদিন এভাবে মনে হয় একা একা থাকতে পারব না।

বেশ তো। বিয়ে করে ফেল। আমি তোর বিয়ের গাড়িতে উঠব। আমি হবো বরকর্ত্রী।

তুই আমার বিয়ের কর্ত্রী হবি কেন। তুই তো নিজেই পাত্রী হবি।

আমার সে লোভ করাটা উচিত হবে না বায়েজিদ ভাই। তুই জানিস আমি

বড় হতভাগী। জন্মের সময় মাকে মেরেছি। বিয়ের দিনেই বরকে। আমি চাই না আমার জন্যে তোর জীবনের কোনো ক্ষতি হোক।

এসব কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করি না। এসব বাকোয়াজ আমার কাছে করবি না।

তোর বাসায় কেউ রাজি হবে না।

আমার বাসা সারাক্ষণ বলতেছে তুই মুক্তিকে বিয়ে করে ফেল।

লোকে কী বলবে? এই মেয়ে একটার পরে একটা বিয়ে করে। বেহায়া বেলজ্জিত।

জি না। লোকে বলতেছে, এই ছেলে এই মেয়ে সারাক্ষণ একসাথে ঘোরে, সারাক্ষণ নাটকটাটক করে বেড়ায়। তাহলে এরা বিয়ে করে না কেন?

সবাই তা বললেও মানুদা চান না আমাদের বিয়েটা হোক।

উনি চান নাই আমাদের সম্পর্ক হোক। ওনার ভয়, তা হলে গার্জিয়ানরা তাদের ছেলেমেয়েদের গ্রুপে আসতে দিবে না। কিন্তু আমরা যদি বিয়ে করি, তাহলেই বরং নাটকের সুবিধা হবে। উনি ওটা বুঝতে পারতেছেন না। আসলে ঈর্ষা বুঝলি। আমাদের নন্দিনীকে আমি বিয়ে করি ফেলি, বৃদ্ধ রাজা সেটা চান না।

যাহ্। কী যে বলিস না!

আমি তাহলে ঢাকা থেকে ফিরে তোদের বাসায় আম্মাকে পঠিয়ে দেব।

আমাকে কেন লোভ দেখাচ্ছিস। আমার ভাগ্যে কি এত সুখ সহ্য হবে?

হতে হবে। আমি তো বান্দর। আমি একটিবার আমার গলায় মুক্তার মালা পরাতে চাই। কী রাজি?

আমি জানি না। আমার ভয় হচ্ছে।

না ভয় নাই।

বিয়ের পরে আমাকে এখনকার মতো করে আদর করবি?

আরও বেশি করে করব।

আমাকে নাটক করতে দিবি?

নিশ্চয়।

আমাদের বাচ্চাকাচ্চা হলে?

তারাও নাটক করবে।

নাটক করতে করতে আমরা ঢাকা যাব। ঢাকায় গিয়ে নাটক দেখব। কলকাতা যাব। নাটক দেখব। আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবি।

তোর পাসপোর্ট আছে ?

নাই।

তাহলে করতে দিতে হবে। পাসপোর্টের বই নাই বলে ক্রাইসিস যাচ্ছে। ঠিক আছে ম্যানেজ করে ফেলব। আগে আম্মাকে তোর বাড়িতে পাঠাই। তারপর ঢাকায় গিয়ে বিয়ের খরচপাতি করে আনব।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

এই কথাটার কোনো মানে হয় না। যার মোচ আছে, আর কাঁঠাল গাছও আছে, সে তো চাকরকে কাঁঠাল পাড়তে বলে নিজের গোঁফেই তেল দিবে নাকি। নাকি তার উচিত ছিল কাঁঠালের গায়ে তেল মাখা।

মুক্তি খিলখিল করে হেসে দিল।

আর সেই হাসিতেই মেঘ কেটে গিয়ে রোদে ঝলমল করে উঠল আকাশটা।



স্বরবর্ণ থিয়েটারের মহড়া কক্ষে আড্ডা জমে উঠেছে। মানুদা এখনও আসেন নাই।

শাহিন সম্প্রতি ঢাকা থেকে ঘুরে এসেছে। সে ঢাকা গেছে সবার কাছে বিদায়-টিদায় নিয়ে। ওখানেই থেকে যাবে বলে। বায়েজিদ তাকে জিজ্ঞেস করল, শাহিন, ঢাকা থেকে কবে আসলা?

শাহিন বলল, এই তো পরশুদিন।

চাকরি-বাকরি পাইলা কিছু?

না পাইলাম না।

কী করতেছো?

প্যাকেজ নাটকে চেষ্টা করতেছি।

মানুদা শুনলে খুব মাইন্ড করবে। মানুদা প্যাকেজ নাটক দুই চোখে দেখতে পারে না।

গ্রুপগুলানেতেও তো যাই। সেদিন গেলাম ছোটলু ভাইয়ের ওইখানে।

ছোটলু ভাই কে?

ওমা জানেন না। যাকের ভাই। আলী যাকের।

আলী যাকেরের নাম ছোটলু নাকি? কী কইল তোমাকে?

পেপসি খাওয়াইল।

উনিও খাইল?

খাইল।

লাবলু হস্তক্ষেপ করল আলাপে, চাপাবাজ। আলী যাকের ভাইয়ের না ডায়াবেটিস...

শাহিন বলল, তাইলে মনে হয় পেপসি খায় নাই। আর যুবদার সাথে একটা নাটক করলাম। শমী আপার ফ্রেন্ড আমি। শমী আপার হাত ধরতে গিয়া আমি তো কাঁপাকাঁপি করতেছি। যুবদা বলে, কাঁপতেছো কেন? তারপর আমারে কানে-কানে কয়, আরে শোনো, শমীর হাত ধরলে আমিও কাঁপি।

বিপ্লবদা বললেন, যুবদাটা কে?

শাহিন বলল, যুবরাজ। আরে খালেদ খান। তাই শুইনা পুলকভাই বলে...

বায়েজিদ বলল, পুলক ভাই, পুলক ভাইটা জানি কে?

শাহিন বলল, আরে জাহিদ হাসান। জাহিদ ভাই বলে, আমি তো প্রত্যেকটা নায়িকার নাম শুনলেই কাঁপি। তাই শুইনা টিপু ভাই বলে, টিপু ভাই হলেন গিয়া তৌকির ভাই, তো টিপু ভাই বলেন, আরে মিয়া তুমি আর কার নাম শুনলে কাঁপবা, মৌ ভাবির নাম শুনলে কাঁপবা...

লাবলু বলল, তৌকির না জাহিদের সিনিয়র, তিনি কেন মৌকে ভাবি বলবেন...চাপাবাজি করো মিয়া। না? ঢাকা শহরে আমাদেরও কানেকশন আছে। সাইদুল আনাম টুটুলভাই সেইদিনও ফোন করছে। বলছে, নাল পিরান, আধিয়ার তো করছিই, রংপুরে আরও নাটক করতে আসব। আর আমাদেরকে চাপা মারে। দুই দিনের বৈরাগী, ভাতরে কয় অন্ন...

মানুদা এলেন। এসে সবার দিকে দৃকপাত করে বললেন, এসেছ তোমরা। সবাই একটু বাইরে যাও। বায়েজিদ থাকো। বিপ্লবদা থাকতে পারেন। মুরব্বি একজন থাকা লাগে।

বিপ্লবদা আর বায়েজিদ ছাড়া সবাই বাইরে গেল। বাইরে গিয়ে কেউ-কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরের পরিস্থিতি আঁচ করতে আড়ি পাতছে।

মানুদা বায়েজিদকে সামনে বসিয়ে বললেন, শোনো, এটা একটা ছোট শহর। এটা ঢাকা শহর না যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। যেমন ইচ্ছা তেমন চলতে পারবে। তোমাদের কাণ্ডকীর্তিতে তো আমার এ শহরে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে। এটা তো কেবল তোমাদের লজ্জা না সমস্ত নাট্যকর্মীদের লজ্জা। কী কথা বলছ না যে?

বায়েজিদ মুখ খুলল, আমি কী বলব? আপনি একাই তো পাত্রের বাপ, আপনি একাই তো মেয়ের বাপ। আপনি একাই বলেন, একাই শোনেন। তাহলেই হবে।

মানুদা বললেন, তোমরা কি তোমাদের চালচলনে শালীনতা বজায় রাখবে। নাকি তোমাদের নিয়ে আমাকে শৃঙ্খলা কমিটির মিটিং বসাতে হবে।

বায়েজিদ মানুদার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের বলতে আপনি কাদের বোঝাচ্ছেন?

মানুদা রেগে গেলেন, ও সেটাও বোঝো না। অভিনয় তো ভালোই শিখেছ?

আপনার শিক্ষা।

কী? আমার শিক্ষা মানে। আমি তোমাদের এইসব ফাজলামো শিখিয়েছি। এইসব নষ্টামি।

আপনি ভাষা ঠিকমতো ব্যবহার করেন। আমি মুক্তির সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে আপনার অসুবিধা কোথায়?

আছে অসুবিধা। মনে রাখতে হবে তোমরা গ্রুপ থিয়েটার কর্মী। তোমাদের চালচলন আচার-ব্যবহার হবে সবার জন্যে আদর্শ। মানুষ তোমাদের দেখে শিখবে। কী শিক্ষাটা তোমরা রেখে যাচ্ছো?

শোনেন আপনার উত্তেজিত হবার কোনো কারণ ঘটে নাই। আমরা ঠিক করেছি আমরা বিয়ে করব। আম্মাকে বলেছি। আম্মা প্রস্তাব নিয়ে বুধবার যাচ্ছে।

কী বলছ তুমি এ সব? মানুদার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

বায়েজিদ বলল, কেন আমরা বিয়ে করতে পারি না?

পারো। কিন্তু কেন করবে? লোকে কী বলবে! মাত্র সেদিন মুক্তির জামাই মারা গেছে। লোকে হাসবে।

লোকে কেন হাসবে? লোকে খুশি হবে। তারা বলবে ভালো ম্যাচ হইছে।

বলবে ওটা থিয়েটার নাকি ঘটকশালা। প্রজাপতি যোগাযোগ কেন্দ্র?

লোকের কথায় আমাদের কী যায় আসে? লোকে তো নাটক করাকেও ফালতু কাজ মনে করে? মনে করে নাটক থিয়েটার যাত্রা করে ফাত্রা লোকে।

তোমাদের এইসব কাজকর্ম দেখে মনে করে। আর এরপর তারা বলবে... বলবে...যদি বলে কাকে তুমি দোষ দেবে যে মুক্তির জামাইয়ের মৃত্যুর জন্যে নিশ্চয় বায়েজিদ দায়ী। নইলে এক গাড়ি লোক...

মানুদা। এসব আপনি কী বলতেছেন? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এসব আপনার মতো বিকৃতরুচির লোকের পক্ষেই কেবল ভাবা আর বলা সম্ভব... আপনি থাকেন। আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি। কেউ আমাদের ঠেকাতে পারবে না। দরকার হলে আমরা স্বরবর্ণ থিয়েটার ছেড়ে চলে যাব। তবু আমরা বিয়ে করবই। এটা আমার শেষ কথা।

বায়েজিদ উঠে পড়ল। বিপ্লবদা শান্তভাবে বলল, বায়েজিদ, রেগে যেও না। মাথা ঠাণ্ডা করো।

বায়েজিদ বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে চিনে বাদাম ভক্ষণরত কর্মীদল বুঝল, ভেতরে একটা ভালো ঝড় বয়ে গেছে।

সেই সন্ধ্যাতেই মুক্তির বাসায় হাজির হলেন মানুদা।

মুক্তিকে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

বলেন।

তুমি নাকি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ।

জি।

কাকে? বায়েজিদকে?

জি মানুদা। দোয়া করবেন।

কিন্তু জানো আমার না কেন যেন মনে হচ্ছে বিয়েটা করাটা ঠিক হচ্ছে না।

কেন মানুদা।

বায়েজিদ আমার একটা খুব ভালো হ্যান্ডস। আমি তাকে হারাতে চাই না এজন্য হয়তো।

মুক্তি হাসল। বায়জিদকে হারাবেন কেন মনে হচ্ছে। বরং আমরা দুজনে মিলে আরও ভালো নাটক করব।

মানুদা বিব্রত কণ্ঠে বললেন, কী জানি তাহলে তোমার মতো একটা নির্ভরযোগ্য পারফরমার হারাতে চাই না বলে হয়তো মনে হচ্ছে।

আমাকেও তো আপনি হারাচ্ছেন না। আমার আগের বিয়ের সময় না আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছিলাম। এবার তো আপনাদের মধ্যেই থাকব।

কী জানি কেন যে তাহলে মনে হচ্ছে।

মানুদা। আপনাকে একটা কথা বলব। আপনি থিয়েটার থিয়েটার করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। সবাই এটা পারবে না। সবার নিজেদের জীবনও গড়ে নিতে হবে। আর ধরেন এভাবে নিজের জীবনটা বিলায়া দিলেই বা কী লাভ। আপনি এক কাজ করেন মানুদা। আপনি বিয়ে করে ফেলেন।

আমার আর বিয়ে করা হবে না মুক্তা।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না।

মুক্তি মানুদার হাত ধরে বলল, মানুদা। আমাদের ওপর রাগ রাইখেন না। আমাদের দোয়া করেন।

মুক্তি আর বায়েজিদ ঘুরে বেড়াচ্ছে ইচ্ছামতো। এক রিকশায়।

তারা বসল কফি হাউজে। কালেক্টরেট মাঠের পাশে এই কফিশপটা রংপুরে চলে বেশ। কফির অর্ডার দিয়ে বায়েজিদ বলল, শোনো, কালকে আমি ঢাকা যাচ্ছি।

মুক্তি বলল, কেন? না, যাবার দরকার নাই।

কেন?

আমার ভয় লাগে।

কাজ আছে। মিটফোর্ডে গিয়ে ওষুধ কিনতে হবে দোকানের জন্যে। আর বিয়ের কেনাকাটা করব। বল শাড়ি কোত্থেকে কিনব?

আমি কী করে বলব? ঢাকায় কোথায় কী পাওয়া যায়, আমি জানি!

শুনছি বেইলি রোডে নাটকও হয়, শাড়িও পাওয়া যায়। ওখানে একবার যাব। আর ভালো কাতান হয় নাকি মিরপুরে। শাহিনকে নিয়ে যাব। ওর সঙ্গে নাকি জাহিদ হাসান, মৌ, শমী— সবার খাতির। ওদের কাউকে নিয়ে যাব দোকানে। চেনা পরিচিত না হলে আবার কী কিনতে কী কিনি, দোকানদার ঠকায়া দিতে পারে।

এত কিছু কিনতে হবে না। আমাদের এখানে বুঝি কিনতে পাওয়া যায় না?

আরে তুই আমাকে মুক্তার মালা দিছিস না? তার বদলে আমাকে তো একটা-কিছু দিতে হবে। বান্দর হলেও তো আমার সাধ-আহ্লাদ আছে।

মা যে আমাকে সেদিন এত কিছু দিয়ে গেলেন তাতে বুঝি হলো না। এই আংটিটা কে পছন্দ করেছে। হাতের বাগদানের আংটিটা দেখিয়ে মুক্তি বলল।

আমি। আমি করছি। খারাপ?

না খারাপ হবে কেন? খুব সুন্দর। খুব সুন্দর। আমি খুব খুশি হইছি বায়েজিদ। আমি খুব খুশি হইছি। আমি আসলে তোমাকেই বিয়ে করতে চাইছিলাম। তোমাকেই পাশে পাইতে চাইছিলাম। আল্লাহর রহমতে আমি তোমাকে পাইতে যাচ্ছি।

এই শোনো, ঢাকায় গিয়ে আমাকে চিঠি লিখবা। আমি তোমার চিঠি পড়তে চাই। লিখবা বলো।

বায়েজিদের গলার স্বর বুজে আসছে আবেগে, সে বলল, পাগল। পাগলি। পাগলি আমার। লিখব। নিশ্চয় লিখব।

মুক্তি হঠাৎ ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, বায়েজিদ বায়েজিদ...

কী ?

দেখো।

মুক্তি কাচঘেরা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে বাইরে দেখাল। বায়েজিদ দেখল, একটা লাশ নিয়ে যাচ্ছে লোকেরা, ঘাড়ে করে, খাটিয়ায়। কতগুলো টুপিপরা লোক সঙ্গে।



রংপুরের ঢাকা কোচ স্টান্ড। সেন্ট্রাল রোডে। রাতের বেলা জায়গাটা গমগম করে। অনেক ঢাকাগামী বাস ছাড়ে এখান থেকে। আগমনী এক্সপ্রেস নামের বাসে বায়েজিদের টিকেট। বারবার হাতঘড়ি দেখছে সে। বাস ছাড়বে রাত ১০টায়। ১০টা প্রায় বেজেই গেল নাকি। রিকশায় হাতে ট্রাভেল ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে বায়েজিদ।

বাসস্ট্যান্ডে নেমে রিকশাভাড়া দিয়ে বাসে উঠে পড়ল সে। হাতে টিকেট। ৫ বি নম্বর সিট। সে উঠে দেখে এক মহিলা বসে আছে ঘোমটা দিয়ে।

বায়েজিদ বিড়বিড় করতে লাগল, আরে মুশকিল। আমার সিটে আবার কে?

পুরো মুখ-মাথা ওড়নায় ঢেকে বসে ছিল মুক্তি। সে বলল, আমি বান্দরি। ওড়না সরিয়ে মুখ বের করে সে খিলখিল করে হেসে উঠল।

বায়েজিদও হাসল—তুমি। উফ। পারোও তুমি।

পারব না। থিয়েটার করি না। বসো। পাশে বসো।

কী ব্যাপার, আমার সাথে ঢাকায় যাবা নাকি?

ভাবলাম যাওয়াই ভালো। তুমি কী কিনতে কী কিনবা।

চলো তাহলে। খুব মজা হবে। আজ পূর্ণিমা। যমুনা সেতুতে বাস যখন উঠবে চাঁদ থাকবে আকাশে। চাঁদের আলো পানিতে পড়লে কেমন লাগবে ভাবো।

এই সময় এক যাত্রী টিকেট হাতে কাছে এসে বললেন, ভাই এই সিট আপনাদের নাকি?

বায়েজিদ বলল, আপনার সিট নম্বর কত?

যাত্রী বললেন, ৫ এ।

বায়েজিদ বলল, এটা আপনার সিট। বসেন। আমরা নেমে যাচ্ছি। আপনার পাশেরটা আমার।

মুক্তি বলল, চলো নিচে নামি। তোমাকে বিদায় দিতে আসছি। বুঝলা না।

তারা নিচে নামল।

মুক্তি বলল, দেখে-শুনে ভালোভাবে যেও।

তুমি এখন একা একা বাসায় যাবা। তুমি বরং ভালোমতো যেও।

একটা ভিক্ষুক এসে তাদের পেছনে লাগল। আব্বা দুইটা টাকা দিয়া যান...

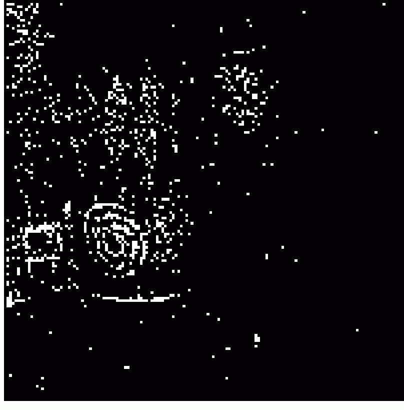
মুক্তি বলল, ভাঙতি আছে? দেও না লোকটাকে।

বায়েজিদ ভাঙতি না পেয়ে ১০ টাকার নোট দিয়ে দিল। ভিক্ষা পেয়ে ভিক্ষুকটি দোয়া করতে লাগল উচ্চস্বরে।

ড্রাইভার উঠে পড়েছে বাসে। বাস ছেড়ে দেবে এক্ষুনি। বায়েজিদ তাড়াতাড়ি করে বাসে উঠে বসল।

বাস নড়তে শুরু করল। তারা দুজনই হাত নাড়ে। বাস চলে গেলে চোখ মুছতে মুছতে মুক্তা একটা রিকশায় উঠল। রিকশা দাঁড়িয়ে আছে যানজটে। সামনে একটা লাশের গাড়ি।

মুক্তি আঁতকে উঠল। সে দোয়া পড়তে লাগল, লা- ইলাহা .... জোয়ালেমিন।



মুক্তির নামে একটা চিঠি এলো বায়েজিদের মৃত্যুর চার দিন পর। বায়েজিদেরই লেখা চিঠি। চিঠি বায়েজিদ লিখেছে:

মুক্তার মালা,

আমি ঢাকায় একদম ঠিকমতো এসে পৌঁছেছি। নাইটকোচে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝে-মধ্যে স্বপ্নে দেখেছি, বাস সোজা খাদে পড়ে যাচ্ছে, তবে সেটা ছিল কেবলই দুঃস্বপ্ন মাত্র। ঢাকায় বাস খুব ভোরে এসে পৌঁছেছিল। আমাদেরকে বাসস্ট্যান্ডে ভোরের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তারপর ভোর হয়ে গেলে আমি কাওরানবাজারে স্টার হোটেলে এসে উঠেছি। তোমাকে পাশের বাসার নাম্বারে ফোন করেছিলাম। বললাম তোমাকে যেন ডেকে দেয়, আমি ঢাকা থেকে বলছি, কিন্তু কেউ তোমাকে মনে হয় বলেই নাই। পরে আবার ফোন করলাম, তখন ওরা বলল, তুমি বাসায় নাই।

জানি না সত্যি বলেছে কিনা।

আজ দিনের বেলা মিটফোর্ডে গিয়েছিলাম ওষুধ কেনার কাজে। এই কাজ মোটামুটি শেষ। এবার বিয়ের খরচপাতি কিছু করব। ইস্টার্ন প্লাজায় জুয়েলারির দোকান ঘুরে দেখেছি। ওখানে মোবাইল ফোনও অনেক রকম পাওয়া যায়। ভাবছি একটা মোবাইল কিনব। রংপুরে যে কেন এখনও গ্রামীণফোন যাচ্ছে না? গেলেই ফোন নিয়ে নিব। তোমাকেও একটা কিনে দেব।

শাড়ির দোকানে গিয়ে কিছুই বুঝছি না। দাম চাচ্ছে অনেক বেশি। এদিকে আমাদের রংপুরের নাটকের লোক বারী ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছি। সাইদুল আনাম টুটুলের সাথেও ফোনে কথা হয়েছে। ওরা বললেন, শাড়ির দোকানে খুবই দরাদরি করতে হয়। ৫ হাজার টাকা দাম চাইলে ৬০০ টাকা বলতে হয়। এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ওরা বলেছেন ফিক্সড প্রাইজ শপে যেতে। আড়ঙে গিয়েছিলাম। আড়ং থেকে শাড়ি কেনা যায়। আর কেনা যায় বেইলি রোড থেকে। কী করব বুঝছি না। বাড়ি ভাই বলেছেন ভাবিকে নিয়ে

আমার সাথে বের হবেন। দেখি তাহলে হয়তো গাউছিয়া চাঁদনি চকে যাব। অন্যান্য কেটাকাটা ভালোই এগুচ্ছে। গায়ে হলুদের সেট কিনে ফেলেছি। আর সুটকেস সাজানোর জন্যে যেসব কসমেটিক লাগে, সেসব কিনতে হবে। বারী ভাই বলেছেন, বড় দোকান থেকে কিনতে। সব নাকি দুই নাম্বার জিঞ্জিরার জিনিসে বোঝাই। তুমি আমার সঙ্গে ঢাকায় এলে ভালো হতো।

জান, আমি তোমাকে খুব মিস করছি। তোমাকে ছাড়া ঢাকা শহরে একদম ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে ধুত্তেরি ছাই চলে যাই।

যাই হোক এসেছি যখন জিনিসপত্র না কিনে ফিরছি না। দোয়া কোরো।

ভালো থেকো।

তোমার জন্যে এক কোটি আদর।

ইতি তোমার বান্দর

বিশেষ দ্রষ্টব্য: তোমার হাতের মাপ আনতে ভুলে গেছি। চুড়ি কিনব কী মাপে?

চিঠিটা হাতে নিয়ে মুক্তি একবার পড়ল। দুইবার পড়ল। তারপর কাঁদতে শুরু করল। প্রথমে ধীরে ধীরে। তারপর ভীষণভাবে। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

একুশে টেলিভিশনের খবরে প্রথম রংপুরবাসী জানতে পারল, বায়েজিদ হোসেন নামের রংপুরের একজন নাট্যকর্মী বায়তুল মোকাররমের সামনে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মারা গেছে।

তার পকেটে গয়নার দোকানের রিসিট ছিল। মনে করা হচ্ছে গয়না কিনে মার্কেট থেকে বের হবার সময় ছিনতাইকারী তার গতিরোধ করে। তিনি বাধা দিলে ছিনতাইকারীরা তার পেটে ছুরি বসিয়ে দেয় এবং তার হাতের ব্যাগ কেড়ে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নেবার পথে তিনি মারা যান। মরার আগে তিনি তার নাম বায়েজিদ হোসেন, বাড়ি রংপুর বলে জানান। তিনি একজন নাট্যকর্মী। তার মৃত্যুর কথা প্রচার হলে ঢাকায় নাট্যকর্মীদের মধ্যে শোক নেমে আসে।

একুশে টেলিভিশনের এই খবর মুক্তি সরাসরি দেখেনি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো রংপুর শহর জেনে যায় এই অপঘাত মৃত্যুর খবর। তাদের অনেকেই ছুটে আসে মুক্তির বাড়িতে।

মুক্তিকে ও মুক্তির ভাবিকে তারা খবরটা দেয়।

মুক্তির ভাবি বিলাপ করতে শুরু করেন।

তিনি রোদনের সুরে বলেন, আল্লার এ কী অবিচার! কেন বারবার এই মেয়েটাকেই শাস্তি দিচ্ছে আল্লাহ। আপনারা বলতে পারেন। মেয়েটা তো কথা পর্যন্ত বলতেছে না। এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতেছে না। তোমরা ওকে কান্দাও ভাই। নাহলে ওযে বাঁচবে না। ওর বুকে যে ভাই অনেক কান্না।

না। কেউ মুক্তিকে কাঁদাতে পারছিল না। যখন লাশ এলো এম্বুলেন্সে, রাখা হলো পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে শহীদমিনারের পাদদেশে, তখন মুক্তিকে কেউ সাহস করে বলতে পারেনি লাশ দেখতে যাবার কথা। মুক্তিও যায়নি। দাফন-কাফন হলো।

স্বরবর্ণ থিয়েটার তো বটেই, রংপুরের সংস্কৃতিসেবী জনগণ বিপুলভাবে যোগ দিল সেসবে। কুলখানিতেও কত লোক। মানুদাকে খুবই ব্যস্ত সময় কাটাতে হলো। হ্যাঁ। ঢাকায় নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুরাও অনেক করেছেন।

সবই হলো, শুধু মুক্তিকে কাঁদানো গেল না।

বায়েজিদের মৃত্যুর দুদিন পরে এলো চিঠি, মুক্তির নামে, মুক্তি সেটা পড়ল।

তারপরই কান্না। তারপরই চেতনা হারানো।



রেজা স্যার হেঁটে হেঁটে এলেন মানুদার বাসায়। বললেন, রাজা, তুমি আবার রঞ্জনকে মারলে? কেন?

মানুদা বিস্মিত, বিরক্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, স্যার আপনি কী বলছেন? আপনি জানেন আপনি কী বলছেন?

রেজা স্যার বিড়বিড় কতে লাগলেন, অল দি ওয়ার্ল্ড ইজ আ স্টেজ অ্যান্ড অল দি মেন অ্যান্ড উমেন মেয়ারলি প্লেয়ারস।

এই উদ্ধৃতিটা রংপুরে খুবই জনপ্রিয়, কারণ টাউন হলের দেয়ালে এটা লেখা ছিল। শেক্সপিয়রের বই পড়ে সেখান থেকে উদ্ধৃতি কণ্ঠস্থ করবার লোক আজকাল কমেই যাচ্ছে।

রেজা স্যার চলে গেলেন। একটু পরে এলেন রহমান সাহেব। মানুদা, আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম। আমাদের প্রডাকশনে বিশুর ক্যারেক্টার করার লোক তো দরকার। আপনি আমার কথা ভাবতে পারেন। আমি আরও ৫ দিব।

রেজা স্যার একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছেন, এমনি উত্তেজনায় রাত দুটোর সময় পায়চারি করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র নামের একটা বই তিনি পড়ছিলেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। কখন যে রাত দুটো বেজে গেছে, তিনি জানেনই না। হঠাৎই রাণুর একটা চিঠি পড়ে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। এ কী বলছে রাণু।

ছোট্ট মেয়ে রাণু। ১৯০৬ সালে জন্ম। ১১ বছরেরও কম বয়সী রাণু প্রথম চিঠি লিখেছিল রবীন্দ্রনাথকে। তখন রবীন্দ্রনাথের ৫৭। রবীন্দ্রনাথের লেখার দারুণ ভক্ত ছিল রাণু ও তাদের পরিবার। চিঠিতে কবিকে বারবার তাদের বাসায় যেতে আমন্ত্রণ ও অনুরোধ জানাত রাণু। প্রথমে রাণু কবিকে সম্বোধন করত রবিবাবু বলে, তারপর রবিদাদা, শেষে তাকে বানাল প্রিয় ভানুদা, আদরের ভানুদা, আমার ভানুদা।

রবীন্দ্রনাথ রাণুকে সব সময় তার কাছে শান্তিনিকেতনে এনে রাখতে চাইতেন। রাণুও আসতেন। থাকতেন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে কবির বিপরীতে অভিনয়ও করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন শিলং-য়ে। সেইবারই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন রক্তকরবী। সৃষ্টি করেছেন বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য চরিত্র নন্দিনী। কাজেই নন্দিনী যে রাণুকে মনে রেখে এবং মাথায় রেখে লেখা সন্দেহ নাই।

রাণুর বয়স তখন ১৭ কি ১৮। রবীন্দ্রনাথকে রাণু গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করেছেন নানাভাবে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বদাই পরিহাসপ্রিয়। রসিকতা করতেন। রসিকতা করে রাণুর প্রণয়প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলেছেন নিজেকে। রাণু কি সে সবকে সত্য বলে জ্ঞান করেছিল?

কিন্তু রবিবাবুকে লেখা রাণুর একটা চিঠি পড়ে রেজা স্যারের উত্তেজনা হলো। কী লিখেছে এসব রাণু?

"ভানুদাদা—আমি কি বলব? ভালোবাসার কি একটা দাবি নেই? ভানুদাদা, আপনি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন না? আমার যে ভারী কান্না পায় ভানুদাদা। .....ভানুদাদা, আমি কত সময় ভাবি যে অভিমান করে আপনাকে চিঠি লিখব না, কিন্তু কি রকম একলা, কি রকম বুকে কষ্ট হয় তাই আজ আবার লিখছি। ভানুদাদা, দয়া করেও কি এক লাইন লেখা যায় না? ভানুদাদা, কলকাতা থেকে ফিরে এসেই আমার জ্বর হয়েছিল। আপনার চিঠি কখানা সেই সময়ই পাই। ভানুদাদা, আমি এত দোষ করেছি যে, আপনাকে আমি আর ভালবাসতে পারব না? ভানুদাদা, আপনিই তো কতবার বলেছেন যে, আমাদের সত্যিকারের বিয়ে হয়ে গেছে। তবে আপনি কি বলে আমাকে এমনভাবে অপমান করেছেন?....ভানুদাদা, আমি কাউকেই বিয়ে করব না—আপনার সঙ্গে ত বিয়ে হয়ে গেছে। ভানুদাদা, আপনি হয়তো মানবেন না কিন্তু আমি মানি। আপনি আমাকে ভালো নাই বাসলেন। আপনি আমাকে চিঠি নাই দিলেন কিন্তু আমি ত মনে-মনে জানব যে একদিন আমি ভানুদাদার সমস্ত আদর পেয়েছি। আমার সমস্ত শরীর ছেয়ে সে আদর আমার মনকে ভরে দিয়েছিল সে ভাবনাটুকু কেড়ে নেবার সাধ্য এ পৃথিবীতে কারুরই নেই ভানুদাদা আপনারও না। নাই বা আপনি চিঠি দিলেন, আমি ত জানব মনে-মনে যে একটা সিক্রেট আছে যা আমি আর ভানুদাদা ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। সেই সিক্রেটটুকুতে ত কারুর অধিকার নেই। ....

ছোট্ট মেয়েটি রবিবাবুকে এত ভালোবেসেছিল। এমনকি মনে-মনে তাকেই বিয়ে করেছিল? হয়তো রবিবাবু এসব বলতেন পরিহাস ছলে, কিন্তু মেয়েটি তো তাকে গুরুতর বলে ধরে নিয়েছিল। হায় রবিবাবু! এভাবে একটি মেয়েকে কাঁদাতে আছে?

অবশ্য রবিবাবুও তাকে ভালোবেসেছিলেন। তার মায়ায় জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাকে কাছে রাখতে চাইতেন। তার বিয়েতে কষ্ট পেয়েছিলেন।

যেমন তিনি, রেজা স্যার কষ্ট পান মুক্তির বিয়েতে? না। রবিবাবুর মতো সৌভাগ্য নিয়ে আসেননি রেজা স্যার, তাকে মুক্তি অত করে ভালোবাসেনি, তেমন করে চায়ও নি। চাইবেই বা কেন? রবীন্দ্রনাথ কবি, রেজা স্যার তো কবি নন। তিনি মূঢ় অধ্যাপক। তিনি আলোচনা করতে পারেন, প্রেমের কবিতা লিখতে পারেন না। সে চেষ্টাও করেননি।

দেখব নাকি আজ চেষ্টা করে?

রেজা স্যার বিছানা ছেড়ে চেয়ার টেবিলে যান। কবিতা লিখতে বসেন।

ঈশ্বর,
তার ডানা দুটো ছোট তৈরি জোছনা দিয়ে
এত ঝড় তুমি দিও না ঈশ্বর সে সইতে পারবে না
ঈশ্বর মগডালে আমি এক বৃদ্ধ শকুন আছি বসে
তুমি আঘাত করতে চাইলে আমাকে করো...

সারা রাত ভূতগ্রস্তের মতো কাটে রেজা স্যারের। সকালবেলা সদ্য রচিত কবিতা নিয়ে তিনি রওনা দেন মুক্তির বাসায়।

মুক্তি তাকে দেখে বিস্মিত। স্যার, আপনি?

অপরিসীম সাহস সঞ্চয় করে রেজা স্যার বলেন, আমি তোমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি।

তিনি কবিতাটা মুক্তির হাতে দেন। মুক্তি কবিতাটার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারে বলে মনে হয় না। সে বলে, স্যার বসেন চা করে আনি।

কবিতাটা কেমন হয়েছে?

আমি তো স্যার কবিতা ভালো বুঝি না।

তোমাকে নিয়ে লিখেছি। ঈশ্বর তোমাকে কেন বারবার আঘাত করছেন। আঘাত করলে তো আমাকেই করতে পারেন।

আমি স্যার অপয়া তো তাই।

কিন্তু আমি কেন তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখছি তুমি জানো?

কেন স্যার?

আমি বলব না। তুমি ভেবে বের করো। আমি পরে তোমাকে আবার জিজ্ঞেস করব। আজ আসি।

চা খেয়ে যান স্যার।

চা আচ্ছা দাও।

রেজা স্যারকে কবিতায় পেয়ে বসে। ফল্গুধারার মতো তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। স্থানীয় সব কাগজেই তার প্রেমের কবিতা একটার পর একটা বের হতে থাকে।

ভানুদা বলেন, স্যার কেন কবিতা লিখছেন, আমি জানি।



মুক্তি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে সারাক্ষণ বিড়বিড় করে রক্তকরবীর সংলাপ বলে। একাই রাজার সংলাপ, একাই ফাগুলালের সংলাপ, একাই নন্দিনী বিশু অধ্যাপকের সংলাপ মুখস্থ বলে যায়।

জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা ও জাগে না কেন?

ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ। আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক তোরা সর্দারকে ডেকে আন বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

রাজা রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জানো, ওকে জাগিয়ে দাও।

আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারিনে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতে পারি।

তবে আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছি নে। কেন এমন সর্বনাশ করলে।

আমি যৌবনকে মেরেছি এতদিন ধরে, আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

....

....

নন্দিনী, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে চলো।

আমি তো সেজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম, রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ঐ দেখো, এসেছে আমার বীর মৃত্যুকে তুচ্ছ করে।

সর্বনাশ। ঐ কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে!

নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার কণ্ঠস্বর—আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও কখনও মরতে পারে না।

হায়রে নন্দিনী,—সুন্দরী আমার। এজন্যেই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে।

নন্দিনী- ৭

ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হবে। ও আবার আসবে।—চন্দ্রা কোথায় ফাগুলাল?

মৃত্যু যেন মুক্তিকে তাড়িয়ে ফিরছে। সে সব জায়গায় কেবল লাশ বহনের দৃশ্য দেখে। সে ছাদে যায় না, পাছে সে পড়ে যায়। সে আগুনের কাছে যায় না—ভাবে আগুন তার গায়ে লাগবে। সে বিদ্যুতের সুইচ ধরতে সাহস পায় না, পাছে না সে বিদ্যুতায়িত হয়। সে অসুস্থ হতে থাকে।



তৌফিক আহমেদ হঠাৎই একটা পাক্ষিক পত্রিকায় পড়েন বায়েজিদের মৃত্যুর খবর। তাতে এও লেখা হয় যে বায়েজিদের সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছিল মুক্তি নামের এক নাট্যকর্মীর। এই খবরের সঙ্গে বায়েজিদের মঞ্চ নাটকের একটা দৃশ্যের ছবি ছাপা হয়। তাতে বায়েজিদের পাশে মুক্তির ছবি। মুক্তিকে দেখে তৌফিক আহমেদের সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে যায়। মুক্তির বিয়ে হয়নি তাহলে।

অনেক দিন ধরেই রংপুরকেন্দ্রিক একটা প্যাকেজ নাটক করার কথা। পাণ্ডুলিপি রেডি। শুধু সময় করে যাওয়া হচ্ছে না। তার আগে মুক্তি মেয়েটাকে একটা ফোন করা দরকার।

তৌফিক মুক্তির পাশের বাসায় ফোন করলেন।

ফোন করে মুক্তির জন্যে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ পরে উত্তর পাওয়া গেল : মুক্তি ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলে না।

তৌফিক একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত পেলেন। এবং আঘাতটা নীরবে হজম করে গেলেন। তিনি ঠিক করলেন, তিনি রংপুরে যাবেন সরাসরি। মুক্তির সামনে দাঁড়াবেন। তার চোখে চোখ রেখে বলবেন, চলো আমার সাথে। মুক্তি না করতে পারবে না।

দীপ্রর ভীষণ জ্বর। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তার মা তার কপালে জলপট্টি দিয়ে জ্বর নামানোর চেষ্টা করছেন। জ্বরের ঘোরে সে প্রলাপ বকতে লাগল : আমি পপআই। আমার অলিভ কই। আমার বউ কই। আমার বউকে এনে দাও।

তারপর সে শুরু করল কান্না।

মুক্তিকে তার কাছে এনে দিতেই হবে।

রেজা স্যার খবর পাঠালেন মুক্তিকে। ভাস্তেটার জ্বর, ও মুক্তিকে দেখতে চাচ্ছে। মুক্তি যেন এসে দেখে যায়।

মুক্তি এলো। তার চোখের চাউনি অসংলগ্ন। সে যেন অন্য জগতে আছে।

দীপ্র তাকে দেখে বলল, অলিভ তুমি এসেছ। আমার জন্যে স্পিনাশ এনে দাও।

মুক্তি চুপ করে রইল।

দীপ্র বলল, অলিভ, তুমি আমার বউ হও, তাই না?

মুক্তি বলল, না।

দীপ্র চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তার কান্না আর থামে না।

রেজা স্যার, দীপ্রর মা বললেন, মুক্তি ও তো ছোট ও তো কিছু বোঝে না। ওকে বলো তুমি ওর বউ। ও থামুক।

মুক্তি কিছুতেই স্বীকার করবে না এই কথাটা।

রেজা স্যার বললেন, তোমার কী সমস্যা মুক্তি। বললে কী হয়?

মুক্তি অস্ফুটস্বরে বলল, আমি যদি বলি আমি ওর বউ ও কিছুতেই বাঁচবে না স্যার। আমি যে বড় অভাগি...

কাঁদতে কাঁদতে মুক্তি বেরিয়ে গেল।

'অলিভকে থাকতে বলো অলিভকে থাকতে বলো' বলে দীপ্রও কেঁদেই চলল এক নাগাড়ে।



মুক্তির মৃত্যুভীতি, একা একা কথা বলা, রাতের বেলা ঘুম ভেঙে গেলে আতঙ্কে ভাবিকে ডাকা—এইসব চলতে থাকলে ভাবি মুক্তিকে নিয়ে যান রংপুর মেডিকাল কলেজের মেডিসিনের প্রফেসর রশিদ তালুকদারের কাছে। ডাক্তার সাহেব সব শুনে বলেন, মুক্তিকে আবার স্বরবর্ণ থিয়েটারেই নিয়ে যান। ও গ্রুপের মেয়ে। গ্রুপে গেলেই ও আস্তে-আস্তে ভালো হয়ে যাবে। ভাবি এক শুক্রবার বিকালে রিকশায় করে টাউন হলের পেছনে স্বরবর্ণ থিয়েটারের দপ্তরে এসে হাজির হন মুক্তিকে নিয়ে। বাইরে স্যান্ডেল আর জুতার ভিড়। ভেতরে রিহার্সাল হচ্ছিল একটা পথনাটকের : মহারাজার উল্টোরীতি।

মুক্তিকে নিয়ে ভাবি কক্ষে ঢোকামাত্রই পুরো ঘর স্তম্ভিত হয়ে যায়।

নীরবতা যেন পাথর, সবার ঘাড়ে চেপে বসেছে।

মানুদা মুক্তিকে দেখে খুশি হন খুব, আসলে এই কদিন তিনি যেতে চেয়েছিলেন মুক্তির কাছে বার বার, কিন্তু তার ভেতরে কোথাও একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল, কোনো দূরবর্তী কারণে তিনি নিজেকে বায়েজিদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী বলে ভাবছিলেন।

মানুদা বলে ওঠেন, আসেন আসেন। মুক্তি আসো। বসো।

ভাবি ডান হাতে বাঁ হাতের চুড়ি নাড়তে নাড়তে বলেন, মুক্তি একা ঘরে বসে থাকে। মন খারাপ করে থাকে। তাই আমিই জোর করে ওকে নিয়া আসলাম। আপনাদের সাথে থাকলে ওর মনটা ভালো থাকবে।

মানুদা বলেন, ঠিক ভাবি। মুক্তি, তুমি এসেছ, আমাদের খুব ভালো হলো। দিনাজপুরের ফেস্টিভ্যালটা তো পিছিয়ে গিয়েছিল, সামনে হবে। চিঠি এসেছে। তুমি থাকলে আমরা আমাদের *রক্তকরবী*টাই করতে পারি।

মুক্তি বলে, আপনারা আমাকে চান্স দিলে আমি অবশ্যই আসব। নাটক করব।

ভাবি বলেন, তাহলে আপনারা রিহার্সাল করেন। আমি আসি।

ভাবি চা খেয়ে যান—রব ওঠে। না আমার কাজ আছে, একটু সুপার

মার্কেট যাওয়া লাগবে বলে তিনি বেরিয়ে পড়েন।

ডাক্তার সাহেব ঠিকই বলেছিলেন। গ্রুপের মেয়ে গ্রুপে ফিরে এসে খুব তাড়াতাড়িই খাপ খাইয়ে নেয়। আবার সে হয়ে ওঠে নন্দিনী।

তাকে বাড়ি পৌঁছে দেন মানুদা। তাঁকে নিয়মিত রবীন্দ্রনাথ বোঝান রেজা স্যার। গোপনে তাকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলো নিজ হাতে কপি করে তিনি একেকটা বইয়ের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখেন। মুক্তি এলে তাঁর হাতে বইটা ধরিয়ে দেন। রেজা স্যারের সেই কবিতাগুলো মুক্তি যত্ন করে তার আলমারির ড্রয়ারে সাজিয়ে রাখে। রেজা স্যার সেগুলো দিয়ে একটা কবিতার বই বের করবেন বলে জানিয়েছেন মুক্তিকে। বইয়ের নামটা কী হবে, এখনও তিনি ঠিক করে উঠতে পারেন নাই। তিনি মুক্তিকে বলেন, শোনো, নামকরণটা খুবই কঠিন বিষয়। রবীন্দ্রনাথ কি রক্তকরবীর নাম একবারে দিতে পরেছিলেন নাকি। বহুদিন ওটার নাম ছিল যক্ষপুরী।

রহমান সাহেব বিশুর চরিত্রে অভিনয় করতে চান। তবে বিশুর চরিত্র করছে যে নতুন ছেলে আমিনুল ইসলাম রবি, সে তাকে বুঝিয়েছে, রহমান ভাই, নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জনের সম্পর্কই তো সবচেয়ে ভালো। আর আপনার লাশের ওপরে যখন মুক্তি আছড়ে পড়ে, তখনই তো আপনার পয়সা উসুল। আমাকে তো মুক্তি একবার একটু টাচও করে না।

দীপ্র সেরে উঠেছে। রেজা স্যারকে মুক্তি বলে, স্যার, আমি যদি বলতাম আমি দীপ্রর বউ, তাইলে কিন্তু আর দীপ্র বাঁচত না!

রহমান সাহেব চেষ্টা করছেন একটা গাড়ি কিনতে। তার জীবনের একটা শখ, মুক্তিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। আস্তে-আস্তে তিনি নিজে গ্রুপের একজন অনিবার্য সদস্য হয়ে উঠছেন, মুক্তি কি তার গাড়িতে উঠতে রাজি হবে না?

একই রিকশায়, সন্ধ্যার পর, মানুদা আর মুক্তি উঠেছে, রিহার্সাল শেষে ফিরছে তারা। আজকে মানুদার সাইকেলটা নাকি নষ্ট। হঠাৎ বৃষ্টি এলে রিকশাওয়ালা ওদের নামিয়ে দিয়ে সিটের তল থেকে বের করল পলিথিন। তারপর ওরা আবার রিকশায় উঠে বসলে হুড তুলে দিয়ে ওদের হাতে ধরিয়ে দিল সেই পলিথিন পেপার। আঁটসাঁট হয়ে ঘনিষ্ঠভাবে বসে মানুদার শ্বাস গরম হয়ে উঠল। তিনি বিড়বিড় করে মুক্তির কানের কাছে বলতে লাগলেন, রক্তকরবীর রাজারই সংলাপ, নন্দিনীরই উদ্দেশে: *নন্দিনী তুমি কি জানো? বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে রেখেছেন। তারমধ্যে থেকে*

ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি না। আমি তোমাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে চাই। না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

অভ্যাসবশত মুক্তি বলে বসে নন্দিনীর সংলাপ : ও কী বলছ তুমি!

মানুদা বাঁ হাত মুক্তির হাঁটুর ওপরে রেখে বলেন, রক্তকরবীর রাজারই মুখস্থ সংলাপ : *বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মনটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতেই মরুর পরিসর বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।*

এতদিন যা কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারই রাশকরা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে...

মুক্তি শ্বাস মিশিয়ে বলে, *তারপর কী?*

মানুদা মুখস্থ বলে যান, *তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে—যাও যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি।*

মুক্তিও মুখস্থ সংলাপ ছাড়ে : *এই রইলুম দাঁড়িয়ে। কী করতে পারো করো। অমন বিশ্রী করে গর্জন করছ কেন?*

মানুদা ফট করে চুমু দিয়ে বসেন মুক্তির ঠোঁটে। দ্রুত, পলায়নপর।

মুক্তির বাসায় মুক্তিকে নামিয়ে দিয়ে নিজের বাসায় ফিরে তিনি রিকশাওয়ালাকে বেশি করে ভাড়া দিয়ে দেন।



মুক্তি রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়ার আগে এসব নিয়ে ভাবে। আরও একদিন, রেজা স্যারের বাসায়, দীপ্রকে দেখে নামার সময় রেজা স্যার তাকে *রক্তকরবী* বোঝাচ্ছিলেন। বললেন, দেখো না এই সংলাপগুলো, ভাবো এসব রাজার কথা নয়। এসব রবি বাবুর মনের কথা। নিজের কথা। ভাবো নন্দিনী আর কেউ না, রাণু স্বয়ং। রাণু তখন শিলংয়ে তার পাশে পাশে। তরুণী। সুন্দরী। তাকে রবি বাবু বলছেন, *'সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নিচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছা করছে। তুমি জানো না, আমি কত শ্রান্ত।'* তোমার মনে হয় না রবিবাবু রাণুর চুল নিয়ে খেলেছিলেন বলেই এমন সংলাপ লিখতে পেরেছিলেন। মুক্তি, তোমার চুলগুলো একটু নেড়ে দেখি...

রেজা স্যার তার চুল নাড়ছিলেন আর মুক্তি কাঁদছিল, আমার রঞ্জন মরে গেছে। আমার রঞ্জন...

মুক্তি আবার কাঁদে। অন্ধকার ঘরে মশারির নিচে শুয়ে তার দুই চোখে জলের ধারা বহে যায়। বাইরে বৃষ্টি নামে। দেয়া ডাকে। বিদ্যুৎ চমকালে তার আলো ঝিলিক দিয়ে যায়।

প্যাকেজ নাটক নিয়ে রংপুর শহরে সত্যি সত্যি হাজির হয়েছেন তৌফিক আহমেদ। তিনি উঠেছেন হোটেল বলাকায়। ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণরাও তাঁর সঙ্গে, একই হোটেলে। আর একটু অগুরুত্বপূর্ণ যারা, তারা উঠেছে সরকারি ডাকবাংলোয়। তৌফিক রংপুর এসেই সোজা চলে গেছে মুক্তির বাসায়। সকালবেলা।

দোরঘণ্টি বাজাতেই দরজা খুললেন মুক্তির বড়ভাই। তৌফিক আহমেদকে সবাই চেনে, ডিশ হাফিজের না চেনার কোনো কারণ নাই। তিনি তাকে সমাদর

করে বসালেন।

কবে আসছেন ভাইজান, ডিশ হাফিজ বললেন।

এই তো আজকেই। রাতের বেলা মাইক্রোবাস নিয়ে এসে পড়লাম। মুক্তি কোথায়?

আমি ডেকে দিচ্ছি। ডিশ হাফিজ ভেতরে গেলেন। কিন্তু তার ফিরবার লক্ষণ নাই। তৌফিক খানিকক্ষণ বসে থেকে অধৈর্য্য বোধ করলেন। তিনি ডাকতে লাগলেন, মুক্তি মুক্তি, ভাবি, ভাবি।

ভাবি এলেন। বললেন, ভাই কেমন আছেন। ভাই একটা ছোট সমস্যা হইছে, মুক্তির তো শরীরটা ভালো না। ও আপনার সাথে এখন দেখা করতে পারবে না।

ও অসুস্থ নাকি। আমি দেখা করি ওর সাথে? তৌফিক চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

ভাবি বিব্রতকণ্ঠে বললেন, আসলে ভাই আপনার ওপরে ওর অনেক অভিমান। ও ফোন করছে, আপনি ধরেন নাই। এইজন্যে।

তৌফিক বললেন, রাগ করারই কথা। কিন্তু আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে, যা দেখালে ও আর রাগ করতে পারবে না।

কী জিনিস? ভাবি ঔৎসুক্যভরে জানতে চাইলেন।

একটা চিঠি।

কার?

বায়েজিদের।

বলেন কী?

আপনিও দেখতে পারেন। তৌফিক চিঠিটা দিলেন।

বায়েজিদ লিখেছে,

তৌফিকভাই। সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। একটা ছোট্ট অনুরোধ করার জন্যে এই চিঠি লিখেছি। আমি মুক্তিকে ভালোবাসি। কিন্তু মুক্তি আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে দ্বিধা করছে। আমার ধারণা, কারণটা আপনি। আপনি কি একটা কাজ করতে পারেন। আপনি আর কোনোদিনও মুক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না। ও ফোন করলেও ধরবেন না। প্লিজ...

চিঠি পড়তে পড়তে ভাবি কাঁদতে লাগলেন। তৌফিক বললেন, ভাবি, আমি লালনের একটা গানের উপদেশ মেনে চলি। পরের দ্রব্য পরের নারী হরণ কোরো না। পারে যেতে পারবে না। আমি অন্যের নারীর দিকে কখনও হাত

বাড়াই না। নেভার।

চিঠি দেখে মুক্তি হেঁচকি দিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল। তার অবস্থা আবার পাগল পাগল। পুরো একদিন সে প্রায় দরজা বন্ধ করে একা ঘরে কাটাল। শেষে দরজা খুলে বলল, তৌফিক ভাই কই। ওনাকে খবর দাও।

তৌফিক আবার এলেন। বললেন, আমি ইউনিটের সব এনেছি। শুধু কয়েক জন লোকাল আর্টিস্ট লাগবে। তাদেরকেও পেয়ে গেছি। তবে আসল জিনিসটা এখনও ফাইনাল হয় নাই। নায়িকার রোলটা তুমি করবে। সেটা তোমাকে জানানো হয় নাই। তুমি আজকের দিনটা রেস্ট নাও। আমরা অন্য শটগুলো নিয়ে নিই। কালকে তোমাকে ডাকব।

মুক্তি একবার ভাবল মানুদার কথা, তার অনুমতি না নিয়ে প্যাকেজ নাটক করা উচিত নয়। কিন্তু সে জানে, মানুদা রাজি হবেন না।

মানুদাকে একটা চিরকুট পাঠাল সে। শুটিং শুরু করার একদিন পর। লিখল : *মানুদা, আপনাকে খুঁজে পাচ্ছি না। একটা পারমিশন নেয়া হয়নি। আমি তৌফিক ভাইয়ের প্যাকেজ নাটক করছি। ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে আপনাকে সালাম করে শুরু করব। সেটা হলো না। পরে সালাম করে নিব।*

মুক্তি অভিনয় করল দারুণ। তাকে ক্যামেরায় দেখাচ্ছে অসাধারণ। শুটিং-এর সবাই খুশি। ক্যামেরাম্যান রাজু আহমেদ একবার মুক্তির মাথায় হাত দিয়ে ওর চুল ঠিক করে দিতে গেল। তাকে টিপ দিয়ে দিল তৌফিকের এসিস্টান্ট শামীম। রাজু ভাই, আর আগাইয়েন না। তৌফিক ভাইয়ের নিজের কেস।

শুটিংয়ের ইউনিটে পরিচালক হিসাবে তৌফিক খুবই নিরাপস। গলা ও মেজাজও তার চড়াই থাকে। শুটিং শেষ হয়ে গেলেই সে আবার খুবই মিশুক ধরনের। মুক্তি শুটিং-এর মজা পেয়ে গেল। কীভাবে একটা একটা করে শট নেয়া হয়, টু শট বা মাস্টার শট হয়ে গেলে আবার ক্লোজ শট হয়। তখন রিএ্যাকশন দিতে হয় বা একই ডায়লগ বারবার দিতে হয়। ব্যাপার আলাদা। প্রথমবার যখন তার অভিনয়ের বেলায় বারবার কাট হচ্ছিল, তখন সে ভেবেছিল সেই পারছে না। পরে দেখল, এটাই নিয়ম। একবারে কখনও শট ওকে হয় না।

শুটিং শেষ হয়ে গেলে তৌফিক সোজা চলে গেল মুক্তিদের বাসায়। মুক্তির ভাবিকে ডেকে বলল, ভাবি, আমি কোনো ভণিতা না করে একটা কথা বলতে চাই। মুক্তির মতো মেয়ে লাখে একটা জন্মায়। ও ঢাকায় গেলে ওকে নিয়ে হুলস্থুল পড়ে যাবে। ওর এখানে পড়ে থাকার মানে প্রতিভার অপচয়। ওকে

আমার সঙ্গে দেন। আমি ওকে নিয়ে ঢাকায় যেতে চাই।

এই কদিনে শুটিং-এর পরে যখন মুক্তি এসেছে বাসায়, যতক্ষণ জেগে থেকেছে, তৌফিকের অনেক প্রশংসাই শোনা গেছে মুক্তির কণ্ঠে। মুক্তি যে তৌফিককে পছন্দ করে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। ভাবি একটু ভেবে বললেন, এমনি এমনি তো আর আপনার সাথে একটা বয়স্থা মেয়ে যাইতে পারবে না। তাই না। আপনি যদি নিয়ে যেতে চান, বিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে।

আমি রাজি। তৌফিক বললেন।

আচ্ছা আমি বলে দেখি মুক্তিকে। ওর ভাইকেও বলতে হবে। ভাবি বললেন।

কিন্তু মুক্তি কিছুতেই বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হতে চাচ্ছে না। সে বলে, আমি তৌফিক ভাইকে খালি পছন্দ করি না। ভালোবাসি। কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি না?

কেন? সবারই প্রশ্ন এটা। ভাবিকে মুক্তি জানাল, সে যেদিনই তৌফিককে বিয়ে করবে সেদিনই তৌফিক মারা যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নাই। কাজেই তৌফিককে বিয়ে করে তাকে সে খুন করতে পারে না।

তৌফিক গেলেন মানুদার কাছে। তাকে কদমবুসি করলেন। তার প্রশংসা করলেন শতমুখে। তারপর বললেন, মানুদা। মুক্তি তো খুব ভালো করেছে আমাদের নাটকে। ইনফ্যাক্ট ঢাকার আর্টিস্টদের চেয়ে অনেক ভালো করেছে। আপনি কি বুঝতে পারছেন?

না।

এই রকম ট্যালেন্টেড একটা মেয়েকে এ শহরে ফেলে রাখা ঠিক না।

ও তো পড়ে নেই। ও এখানে থিয়েটার করছে।

কিন্তু ধরেন মুক্তি যদি ঢাকা যায়, নিয়মিত অভিনয় করে, তাহলে সারাদেশ তার অভিনয় দেখতে পাবে। ওর নাম হবে।

নামটা কি খুব দরকার?

না কিন্তু ওর প্রতিভার আলো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে কি ভালো না?

আপনি কী করতে চান?

ওকে ঢাকায় নিয়ে যেতে চাই।

ইয়ং একটা মেয়ে ঢাকায় আপনার সাথে কেন যাবে? নিরাপত্তা কোথায়?

সত্যি কথা বলতে কী, আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি।

আরে ঢাকার লোকের প্রেম। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই মাথা ঘুরে যায়।

আমি ওর প্রেমে পড়েছি ও সুন্দরী বলে নয়। ওর গুণ আছে বলে।

তা কী করতে চান।

ও ঢাকায় যাবে। দরকার পড়লে আপনিও যাবেন। খরচ সব আমি দেব।

তারপর ও যদি ফ্লপ করে, আমাদের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

তা কেন?

ওকে কি আপনি বিয়ে করে নিয়ে যেতে পারেন।

নিশ্চয়। যদি ওর আপত্তি না থাকে।

আপনি কি ওর ঘটনা জানেন?

কী?

ও বড় অভাগি। আর ওর কাছে যে যায় সেই মারা পড়ে। জন্মের সময় ওর মা মারা গেছে। ওর বিয়ে হয়েছিল যার সাথে, সে মারা গেছে বিয়ের দিনই। আর ও ভালোবাসত যে ছেলেটাকে, আমাদের গ্রুপের, ওর জন্যে বিয়ের খরচ করতে গিয়ে মারা যায়। এবার তিন নম্বর পুরুষের মৃত্যুর পালা। এক জ্যোতিষী বলেছেন, পরপর তিনটা স্বামী মরার পরে ওর দুর্ভাগ্য দূর হবে।

হা হা হা। আপনি গ্রুপ থিয়েটার করেন, প্রগতিশীল আন্দোলন করেন, আর জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। ফানি তো। আমি করি না। ও সব নিয়ে আমার ভয় নাই। আমি শুধু চাই যে সে আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করুক। দয়া করে নয়। মোহের বশে নয়।

ঠিক আছে। আমি বলে দেখি।

আপনি বললে মুক্তি না করতে পারবে না। মুক্তি আপনাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে।

মানুদা মুক্তির সঙ্গে দেখা করে বললেন উল্টো কথা। বললেন, না মুক্তি, তোমার মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত না। তুমি প্যাকেজ নাটক করেছ। আমি তোমাকে বাধা দিইনি। কিন্তু তুমি ঢাকায় যাবে টিভি নাটক করতে এটা হওয়া উচিত না।

মুক্তি বলল, প্রশ্নই আসে না। আমি কক্ষনো যাবো না।



রেজা স্যার তাঁর বাসায় ঢাকার শুটিং দলের সম্মানে চায়ের আয়োজন করেছেন। শুটিংয়ের লোকেরা সব এসেছে। তারা চা বিস্কিট নাশতা নানা কিছু করছে।

এক কোনায় তিনি নিজে মদ খাওয়াচ্ছেন একটু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের।

রেজা স্যার দুই পেগ খেয়েই মুখ খুলতে শুরু করলেন। তৌফিক সাহেব, আমি কিন্তু আপনার অভিনয়ের খুব ভক্ত। বিশেষ করে ওই যে ওই নাটকটায়...ওই যে শেষ প্রতীক্ষা, ওটাতে যে আপনি হকার হয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল আপনি যেন ১৪ পুরুষের হকার। শোনেন আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। ওই দিকে আসেন।

তৌফিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সঙ্গে এক কোনায় গেলেন। রেজা স্যার বলে চলেছেন, মুক্তি মেয়েটা অভিনয় কেমন করছে? দারুণ না। হুঁ। আমিও তাই ভেবেছি। ও আসলে স্বাভাবিক মেয়ে নয়। মাঝে-মধ্যে মনে হয় ও পৃথিবীর মেয়েই নয়। ওকে কিন্তু বিয়ে করতে যাবেন না। সব করুন। ভালোবাসুন, কাছে টানুন, বাট নো ম্যারিজ।

বিয়ে যদি করেন, ২৪ ঘণ্টা। ব্যস। তার বেশি নয়। ইউ উইল ডাই। দেয়ার আর মেনি থিংস বিটুইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ।

এই পার্টিতে রহমান সাহেবও আছেন। তিনি আবার তৌফিককে ডেকে এককোণে নিয়ে গেলেন। শোনেন ভাই সাহেব। আমার নাম রহমান। তিনটা ইটের ভাটা আছে। আমি মুক্তিকে ভালোবাসি। কিন্তু তাকে আমি বিয়ে করতেছি না। কেন জানেন তো! বিয়ে করলেই মৃত্যু। ভয়াবহ মেয়ে। দেখলে মনে হয় নিরীহ। আসলে না। ভয়াবহ। ডোন্ট পুট ইয়োর হ্যান্ড ইন টু দিস কেইস। হাত পুড়ি যাবে। জীবন কয়লা হয়ে যাবে। আমার তো শুধু মন পুড়েছে....

স্থানীয় এক মাস্তান প্রস্তাব পাঠিয়েছে, সে মুক্তিকে বিয়ে করতে চায়। মুক্তি তাকে বিয়ে করতে চায় না। বস্তুত কোনো মেয়ের পক্ষেই ওই কুখ্যাত যণ্ডা ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হওয়া সম্ভব না। মাস্তান ভয় দেখাল মুক্তিকে সে

অপহরণ করে নিয়ে যাবে। তখন অনেকটা নিরাপত্তার খাতিরেই মুক্তিকে সরানো জরুরি হয়ে পড়ল।

ডিশ হাফিজ ও ভাবি নিজেরা উদ্যোগী হয়ে তৌফিকের জিম্মায় ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন মুক্তিকে। মুক্তির সঙ্গে তৌফিকের বিয়ের কাগজপত্র সইও করা হলো গোপনে। কিন্তু মুক্তি কিছুতেই ধর্মীয় নিয়মকানুন মেনে বিয়ের পর্ব সারতে রাজি না। তার এক কথা, মন্ত্র উচ্চারণ করা মাত্রই তৌফিকের ক্ষতি হবে। তৌফিক মারা যাবেন।

ঢাকায় এসে মুক্তি উঠল কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে।

সন্ধ্যার পর তৌফিকদের গ্রুপ থিয়েটারে যাতায়াত শুরু করল সে।

এরই মধ্যে তার অভিনীত নাটকটি টেলিভিশনে প্রচারিত হলে ব্যাপক হইচই পড়ে গেল তাকে নিয়ে। প্যাকেজের নির্মাতারা তার খোঁজ করতে লাগল আঁতিপাঁতি করে।

মুক্তি কোনো প্রস্তাবই ফিরিয়ে দেয় না। আবার কোনো প্রস্তাবেই রাজি হয় না। সে তৌফিকের সঙ্গে পরামর্শ করে। নিতান্ত ভালো পরিচালক যারা, তাদেরটা ছাড়া সে অভিনয় করবে না।

কিন্তু অভিনয় জগতে এসে সে দেখল, এখানেও সেই একই চক্র। সেই রাজা, সেই অধ্যাপক, সেই বিশু, সেই রঞ্জন। রক্তকরবীর মতোই কেউ শুধু তার সঙ্গে একটু হেসে কথা বলতে পারলেই বর্তে যায়, কেউ চায় একসঙ্গে রেস্তরাঁয় খেতে, কেউ-কেউ ঈর্ষা করে তাতে। কেউ বা প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলতে চায়। কেউ বা দাবিয়ে রাখতে তৎপর। তাকে উপেক্ষা করে, পাত্তা দিতে চায় না, এই রকমও তো আছে। আর সে হোস্টেলে থাকে শুনে অনেকেই তার উপকার করতে চায়। সে কোথায় সময় কাটাবে? অলস দুপুর, ক্লান্ত বিকাল, দীর্ঘ রজনী! প্রযোজকের সঙ্গে গেস্ট হাউসে, পরিচালকের সঙ্গে শুটিং বাড়িতে, নায়কের সঙ্গে আউটডোর লোকেশনে তার রুমে, সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো নির্জন ফ্লাটে, ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে স্টুডিওতে, প্রডাকশন হাউসের মালিকের সঙ্গে তার অফিস কক্ষে। যে-কোনো জায়গাতেই সে রাত কাটাতে পারে। দুপুর কাটাতে পারে। বিকাল কাটাতে পারে। এ এক আশ্চর্য জগৎ। এখানে নিজের মন মতো চলা কঠিন। বাছবিচার করলে পেশায় উন্নতি নাই। পরিচালকের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয় তাকে। একটু ঝুল দিতে হয়। অভিনেতারা তাকে নানাভাবে তোয়াজ করে। সবার সঙ্গে সারাটি ক্ষণ অভিনয় করে চলছে সে। কারও সামনে প্রেমে পড়া মেয়ের, কারও সঙ্গে রাগী মহিলার চরিত্র ধরে রাখতে হচ্ছে। এভাবে কতদিন চলা যায়? তবু ভাগ্যিস সবাই জানে তার একজন

অভিভাবক আছেন। তৌফিক আহমেদ। তাই কেউ তার ওপরে জুলুম করে নি। কিন্তু অভিভাবকহীন একটা মেয়ে এই জগতে এলে সে টিকবে কেমন করে?

একদিন তার খুব প্রিয় পরিচালক মদ্যপান করে তাকে জড়িয়ে ধরলে মুক্তি সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলে। এর মধ্যে তৌফিক অনেকদিন তাকে ফোন করেছেন, কথা বলেছেন, বুঝিয়েছেন, তাদের বিয়ে তো হয়েই গেছে কাগজেকলমে। এখন তারা বৈধ স্বামী-স্ত্রী। মন্ত্র পড়ারও দরকার নাই। তারা বিয়ের কথা প্রকাশ করলেই তো পারে। মুক্তি রাজি হতে চায়নি। তৌফিকের ভালোর জন্যেই চায়নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুক্তি বুঝল, ঢাকা শহরটা নন্দনকানন নয়, এটা হলো যক্ষপুরী।

সে তৌফিককে বলল, বিয়ের ঘোষণা দাও। আমি তোমার ওখানে গিয়েই উঠছি। আর এর জন্যে যদি তোমার মৃত্যুও হয়, কী করা যাবে, নইলে এই শহরে আমি মানসম্মান নিয়ে তো থাকতে পারব না।

তৌফিক আর মুক্তি ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা দিল, আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি।

সুদূর রংপুরে বসে খবরের কাগজে সেই খবর পড়ে রেজা স্যার ফোন করলেন মানুদাকে। রাজা, এবার মারবে না রঞ্জনকে?

মানুদা বলেন, স্যার, আমার মাথার মুকুট তো কাগজের মুকুট, আমার তলোয়ার তো টিনের তলোয়ার। আমি কেমন করে মারব?

চলে আসো। পান করতে করতে তোমাকে ব্যাপারটা বোঝাই।

মানুদা চলে এলেন। রেজা স্যার গেলাস সাজালেন। রেজা স্যার বললেন, রক্তকরবীর যবনিকা যেখানে পড়ে, জীবনের গল্প কিন্তু সেখানেই শেষ হয় না। ধরো, নন্দিনী বেঁচে আছে, বিশু বেঁচে আছে, রাজার যক্ষপুরী ভেঙে পড়ছে কিন্তু রাজা তো বেঁচে আছেনই। তারপর কী হলো? নাটক শেষ হলেও কাহিনী তো শেষ হয় না।

মানুদা বললেন, তারপর মুক্তিকে বিয়ে করল প্যাকেজ নাটকের হিরো। শেষ।

না মানু শেষ না। রাণু কিন্তু বিয়ের পরেও রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছেন।

লিখেছেন নাকি? ঠিক করেননি।

ঠিক করেছেন। রবীন্দ্রনাথও চিঠি লিখেছেন রাণুকে। তবে আগের চিঠি আর পরের চিঠির অনেক তফাত। অনেক।

কী রকম?

বিয়ের পরের চিঠিগুলো সব ছোট। তাতে কাজের কথা। হৃদয়ের কথা নাই। প্রকৃতির বর্ণনা নাই। সেই হাস্য-পরিহাস নাই।

কেন? নাই কেন?

কারণ বিয়ের আগে রাণু ছিলেন নন্দিনী। আর বিয়ের পরে তিনি লেডি রাণু মুখার্জি। কী বুঝলে? রাণুর বয়স বাড়ে। রাণু বুড়ো হয়। মানবদেহ নশ্বর। বয়সের বলিরেখা পড়ে তাতে। সে মরে যায়। পচে যায়। হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কিন্তু নন্দিনী! মরে না। মুক্তি অন্যের ঘরের বউ হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের নন্দিনী তো কারও ঘরের বউ না। সে আমাদের কাছে সব সময়ই থাকবে।

মানুদা তখন বিভু হয়ে যান। গেলাস হাতে টলতে টলতে তিনি বলতে থাকেন : *যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি...এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনও আলো দেখা যাচ্ছে। ...তুমি আমার অগম পারের দূতী। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।*

মানুদা গান ধরলেন :

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো
ওগো দুঃখ-জাগানিয়া!

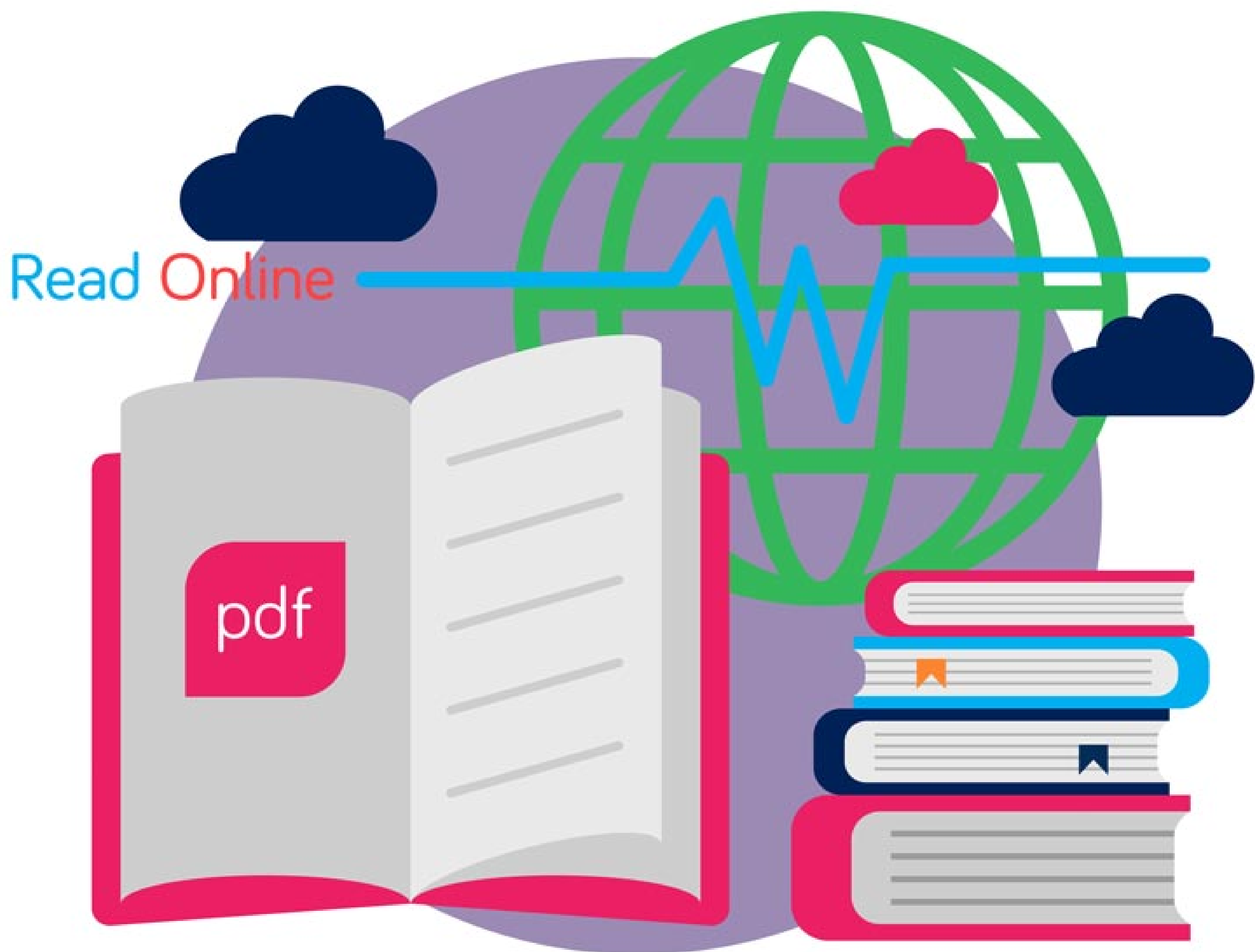
গান গাইতে গাইতে তারা দুজনে কাঁদেন, দুজনে হাসেন, দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেন।

আর তারা অপেক্ষা করেন একটা দুঃসংবাদ শোনার জন্যে। তৌফিক আহমেদ অপঘাতে মারা গেছেন।

দিন যায়।

বছর যায়।

সেই দুঃসংবাদ এখনও এসে পৌঁছেনি তাঁদের কাছে। কিন্তু তাঁরা অপেক্ষা করেন।


Read Online
pdf